অরণ্য-ভারত
বিকাশকান্তি রায়চৌধুরী

অরণ্য-ভারত

॥ প্রথম প্রকাশ ॥
পৌষ ১৩৭০
নববর্ষ ১৯৬৪

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীমতী শিপ্রা রায়চৌধুরী
৮৪সি, নিমু গোস্বামী লেন,
কলিকাতা ৫

ছবি এঁকেছেন—
শ্রী ইন্দু গুপ্ত

ব্লক করেছেন—
ন্যাশানাল হাফটোন কোঃ
প্রসেস এণ্ড কলার প্রিন্টস্
ইউনিভার্সাল ব্লক ষ্টুডিও

ব্লক ছেপেছেন—
ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও

বই ছেপেছেন—
সুধীরকুমার বসু
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৪১, অনাথনাথ দেব লেন, কলিকাতা ৩৭

—পরিবেশকগণ—

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২
অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২
সাহিত্য চয়নিকা
৫৯, বিধান সরণি, কলিকাতা ৬

*

দাম : সাড়ে তিন টাকা

প্রকাশকের নিবেদন

এ বইয়ের লেখাকে নোতুন করে পরিচয় দেবার কিছু নেই। বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়গুলি এর আগেই প্রকাশিত হয়েছে আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়ের পাতায়, যুগান্তর সাময়িকীতে, মাসিক বসুমতীতে আর বসুধারায়।

পত্রিকা সম্পাদকেরা দিয়েছেন তাঁদের প্রীতিপূর্ণ পক্ষপাতিত্ব, সাহিত্য-সুধীজন দিয়েছেন তাঁদের অকৃপণ প্রশংসা, আর দরদী পাঠক সমাজ সঞ্চার করেছেন প্রকাশকের সাহস।

—তাই এই সঞ্চয়ন।

লেখকের দীর্ঘ অরণ্যজীবনের অনেক কাহিনী আজ প্রায় রূপকথার গল্পে রূপান্তরিত হয়েছে সুন্দরবনের আবাদী অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে। দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর সেই ঘটনাবলী।

'অরণ্য ভারত' তাই দস্তুরমত শিকারের বই হতেও পারতো। তা যে হয়নি তার কারণ আরণ্যকের অকারণ হত্যায় লেখকের মন সায় দেয়নি কোনো দিনও—নির্বিচার হননে তো নয়ই। এমনকি দুর্দান্ত মানুষখেকো বাঘের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লেখক নিজের অমানুষী হিংস্র বন্য রূপান্তরকেও মনে মনে মেনে নিতে পারেননি।

বন্যজীবনের মহান ছন্দেই 'অরণ্য ভারত' হোক তাই অরণ্য মহাকাব্য।

লেখকের আরো বিচিত্রতর অনেক ঘটনার অভিজ্ঞতা নিয়ে বর্ধিত কলেবরে আরও শোভন-সুন্দর সজ্জায় 'অরণ্য ভারত' দ্বিতীয় পর্বে প্রকাশ কোরবার ইচ্ছা আছে। আশা রাখি, দরদী পাঠক সমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় 'অরণ্য ভারত' হবে মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অরণ্য সংহিতা—আরণ্যকের জীবন বেদ।

ভূমিকা

কি জানি কেন, দুর্গম গিরি দুস্তর মরু আমায় হাতছানি দেয় যেন। নীল সায়রের তুফান ডাকে চোখের ইসারায়। নীল আকাশের তারা ডাকে আয়-আয়-আয়।

আর ডাকে ঐ অরণ্য আদিম। জানি, ভয় ওখানে ভয়ঙ্কর। কিন্তু ক'জনাই বা জানে যে ওর ঐ নীলাঞ্জনের মায়ায় সত্যবন্দী হয়ে আছে শিব আর সেই চিরসুন্দর। অরণ্য সুন্দরের আলো—ও যে আমার নিঝুম রাতের এক নিত্য আলেয়া।

বনের একটা রূপ আছে—থাকবেই তো। সে রূপ আছে সমুদ্র গভীরে। ওর সুধা সমুদ্র-মন্থন করতে পারলে তবেই শুধু ধরা সম্ভব তাকে। বনলক্ষ্মী কি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীর চাইতে রূপে খাটো, না সম্পদে দীনা। দ্বিপদীর দুনিয়ার মতই অখণ্ড বন্যতার বেষ্টনী জুড়ে আছে বলিষ্ঠ সামাজিকতা, আছে যৌবনোচ্ছল দুটি প্রাণের কানাকানি, আছে কোলাহলমুখর সংসার। হিংস্র হত্যাকারীর চোখে ধরা পড়ে না সেই শ্রীময় অরণ্যরূপ।

প্রয়োজনের তাগিদে শক্তিমান মানুষ বন কেটে গড়েছে বসতি, আদিমকে করেছে আধুনিক, আরণ্যকদের করেছে উদ্বাস্তু। অরণ্যচারীর চারণভূমি আজ দস্তরমত সংকুচিত। বেপরোয়া বন্দুকধারীর নির্বিচার হননের হিংস্রতা আজ হার মানিয়েছে আদিমকেও।

অতীত অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় বেছে নেওয়া ক'টি কাহিনীকে তুলে ধরে আমি তাই বোঝাতে চেয়েছি যে সহ-অবস্থান অসম্ভব নয় অন্তত।

ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র অনেক কাণ্ড করে বশিষ্ঠ মুনির স্বীকৃতি পেয়ে ব্রাহ্মণ হলেন শেষ পর্যন্ত। ময়না শিকারীর স্বীকৃতি না পেয়ে জাতে উঠিনি কিন্তু আমি।

প্রার্থনা আমার শুধু এইটুকু—

মোর নাম
এই বলে জ্ঞাত হোক—
বন্যেরে বেসেছি ভাল
আমি সেই লোক।

গ্রন্থকার

শৈশবে যিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন সুন্দরবনের গভীরে, কৈশোরে যাঁর কাছে অধ্যয়ন করেছি অরণ্যকাণ্ডের মহাকাব্য, প্রথম যৌবনের জিঘাংসা বৃত্তিকে সংযত করে পরিবর্তে যিনি শেখালেন ওদেরকে ভালবাসতে আর দেখালেন ওদের শুচি সুন্দর শ্রী ও প্রাণপ্রবাহের ফল্গুধারা—আমার এই লেখা উৎসর্গ করলুম পরমারাধ্য সেই ৺ পিতৃদেবের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে।

॥ এই বইয়ের ছবি ॥

এক

রুজি রোজগারের চাকাটা যখন চরকি পাকে ঘুরতে শুরু করে তখন সেই চাকায় বাঁধা মানুষটার নাভিশ্বাস উঠবারই কথা। তবে ওর সুবিধেটা এই যে অর্থকৌলীন্যে নিকষ কুলীন না হয়েও মহাভারতের এই মহাদেশটাকে অশ্বমেধের ঘোড়ার মত চৌহদ্দী করে ফেরা যায়। সমুদ্রের জোয়ার ভাটার মতই যেন এক অনিবার্য আকর্ষণে শহর থেকে শহরান্তরে হামেশাই তো গড়িয়ে চলেছে এক দুরন্ত জনস্রোত। আধুনিকতার সেরা অবদান হচ্ছে বোধ হয় এই অতি ব্যস্ততা। দ্বিপদীর গোটা দুনিয়াটাই দেখি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে চলেছে উর্ধ্বশ্বাসে—ব্যাঘ্রতাড়িত হরিণী যেন। কারণে অকারণে চাই অর্থ—আরও অর্থ। অন্তত অনর্থ ঘটাতে পারে এত অর্থ। তাই তাকে আশ্রয়ের আশায় বন কেটে বসতি বানাতে হয়, অরণ্যের ঐশ্বর্য অপহরণ করে ক্ষুধা মেটাতে হয় এই নাছোড়বান্দা শতাব্দীর। সে আমলের সেই দৃষ্টি-জোড়া বনভূমি আজ ক্ষয়িষ্ণু। দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-পরিধিতে তার বিশ্বম্ভর রূপ এসে ঠেকেছে বামন অবতারে। তা হোক। আজও সে তেমনি মহামহিম। মহাভারতের যে কোন দানশীলতাও হারিয়ে গেছে মহাকালের গর্ভে। কিন্তু বনলক্ষ্মীর দান যে কালের গণ্ডীকে অস্বীকার করে আদি থেকে অনন্তের সীমা-রেখায় প্রসারিত। আর সে দান তো পরিমিত নয়, অপরিমেয়; সেকালের নয় শুধু, একালেরও—সে সর্বকালের।

ময়না শিকারীর মন বসেনি সুন্দরবনের সদ্য আবাদী জমির চাষবাসে। বরং নদীর ওপারের ঐ নিবিড় বনভূমির বাসিন্দারা যেন পৌরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ওকে আহ্বান করতো দ্বৈরথ সমরে। আর কালী কপালী! জাতবিচারে কালী ছিল কাপালিক। কপালের

উপর সিঁদুর দিয়ে আঁকতো সে মা কালীর ছবি। তাই মানুষের মুখে মুখে নামটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিল কালী কপালী। কিন্তু সে কথা এখন থাক। দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি হয়ে কলমের ডগায় সৃষ্টি করলেন এক অনুপম অরণ্যকাব্য। কালী কপালীও তেমনি একদিন তার দুর্ধর্ষ দলের সর্দারী ছেড়ে ডাকাত থেকে হলো সন্ন্যাসী। চাষের হল ছেড়ে হাল ধরল সে আমার জীবনতরীর। মৌচাকের মৌ চুরি করে ক'পয়সা তার রোজগার হতো সে হিসাব নিকাশ করেনি কালী কোনদিনও। তার লাভ-লোকসানের খতিয়ানটাকে খতিয়ে দেখলে লোকসানের অঙ্কটাই হতো অনেক বেশি। তবু যে সে অরণ্যের অন্দর মহলে ছুটে যেত এই ছলে, তার কারণটা তো আর কিছুই নয়—অরণ্য-আলেয়া হাতছানি দিয়ে ডাকতো ওকে। কিশোর বয়সে এদের কড়া পাহারায় প্রথম যেদিন পা দিয়েছিলুম বনের কাদায় সেদিনের সেই সুন্দরবনটাকে একটুও সুন্দর মনে হয় নি। কিশোর মনের উপর এক অদম্য কৌতূহলের ছাপ এঁকেছিল শুধু ওর শাখাচারীরা। অরণ্যকে ছেড়ে ভালবেসেছিলুম আমি আরণ্যকদের। সেদিন থেকে আমিও বুঝি এক নিঃসঙ্গ আরণ্যক।

নাটকের নায়ক ওথেলো জীবনকে বিপন্ন করে পেয়েছিল যতটুকু, তার চাইতে অনেক বড় অসামান্যকে জয় করেছিল সে শুধু ওর জীবনটাকে গল্পে রূপান্তরিত করে।

অরণ্যচারী মানুষের জীবনেও আছে তেমনি অজস্র অবেগময় মুহূর্ত, সহস্র শিহরণ, রোমাঞ্চিত বুকের স্পন্দন। যদি গল্প বলার যাদু আমার থাকতো! সুন্দরী ডেসডিমনার স্বজাতি স্বজনের ডাগর চোখে কত মায়া আছে কি জানি। হিল্লী-দিল্লী-কাশী-কাঞ্চী-বম্বে-ট্রম্বের এই শহর ভারতবর্ষটাকে যে আমি যাযাবরের মত পরিক্রমা করে ফিরেছি সে শুধু প্রয়োজনে—পেটের ক্ষুধার পীড়নে বা বিশ্বলীলার বাস্তব কিছু দেখবার মাদকতায়। কিন্তু সুন্দরবনের

গহন থেকে আসামের বন্য গভীরে, অরামকণ্টকের কণ্টকাকীর্ণ আঙিনা থেকে অরণ্য ত্রিকুটের অপাপবিদ্ধ গিরিচূড়ায়, পুনাথের পাষাণ-পুরীর বন্দীশালা থেকে সিভকের সর্পিল পথে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় যে, সে আবার কোন আলেয়া! যে মন বৃন্দাবনের কাননে কুঞ্জে পরশ পেতে চায় বিশ্বমাধুরীর, সে কেন বেহিসেবীর মত পা বাড়াবে কাম্যবনের দুর্গম পথে। বনময়ূরীর প্রিয়সম্ভাষে মানুষের কি যায় আসে!

শুধু মহাভারতের স্ববাসে কেন, প্রবাসের কথাও বলিনা এবার কিছুটা।

ঐ সিন্ধুর টীপ সিংহল দ্বীপ। সেতুবন্ধনে বাঁধা স্বর্ণলঙ্কা, কলম্বো ওর সেরা শহর। রুজ-পাউডারের প্রসাধনে বা অতি আধুনিকার কেতাদুরস্ত চালচলনে কলম্বো বিলাসিনী তো বটে। রঙ-রঙানো ওষ্ঠপ্রান্তে ওর হাসি। আর কাণ্ডি! নিক্কোর মত নবযৌবনা উর্বশী সে নয় সত্যি। না হোক। জাতবিচারে সেও তো অপ্সরা। তবে ওদেরকে ছেড়ে মনটা কেন মেতে উঠলো পেরাডিনিয়ার পাহাড়ী বনে! যন্ত্ররথের আরামী গদীতে অলস তনুখানি এলিয়ে দিয়ে শিল্পী মানুষ ছোটে সিগরির সিংহদরজায়। কালজয়ী শিল্পের স্বাক্ষর রয়েছে সিগরির প্রাসাদ-দুর্গে। সিগরি ঐতিহাসিক। তাই ওর ইতিহাসের অন্ধকূপের আশেপাশে ঘুরে মরে মনটা, মানুষের শিল্পসাধনার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বুভুক্ষু চোখজোড়া। সিগরি শিল্পী ও সত্যসন্ধানীর কাছে এক আনন্দময় স্মৃতি। ঘন সবুজের আস্তরণে ঢাকা পাহাড়ী বনের রূপবৈচিত্র্যে সেও তো কিছু কম যায় না। কিন্তু ঐ রূপটুকুই শুধু আছে তার। সজীবতার প্রাণস্পন্দন কই? সে যে আরণ্যকের চঞ্চল লীলায় মুখর নয়। শিল্পী যেমন মাটির পুতুলে আঁকে রূপের মায়া, প্রকৃতি তেমনি সিগরির বনখণ্ড জুড়ে এঁকেছে তার সহস্র ছবি—অপরূপের ছায়া। শিল্পীমন হয়তো খুব খুশি হয়, কিন্তু অরণ্যচারীকে ভোলায়

না সে—অরণ্য-আলেয়া নেই তো ওর। মাটির পুতুলের সাথে মানবীর তুলনা চলেনা তো। সিগরি তাই শুধু রয়ে গেল এক আনন্দ-উচ্ছল স্মৃতি। কিন্তু ঐ আদম পাহাড়ের আরণ্যকের দল! ওরা আজও আমার কাছে যে তেমনি জীবন্ত। ঐ তো হরিণশিশু তীরের মত ছুটে চলেছে পাহাড়ী উপত্যকায়, হস্তীযূথ এসে হাজির হয়েছে গাল-ওয়ার ছোট্ট বিমান বন্দরে। ক্ষুদে ক্ষুদে চোখগুলোকে বিস্ময়ে বিস্ফারিত করে দেখছে আকাশ পথে উড়ে-চলা ইস্পাতের এই আজব পাখিটাকে। ঘুরপাক খেয়ে বিমান নামলো বন্দরের মাটিতে। অদূরে দাঁড়িয়ে জঙ্গলের এই দৈত্যদেহী জানোয়ারের দল শুণ্ড উঁচিয়ে বোধ হয় স্বাগত জানাল দ্বিপদী আগন্তুকদের। ওদের শুণ্ডের চাইতে মানুষের মুণ্ড অনেক বেশি প্রতাপী। গাল-ওয়ার জলসেচ পরিকল্পনা রূপ নিচ্ছে তখন। ওর খালের কাদায় গা ডুবিয়ে আছে বুনো মহিষের দল। মানুষ স্নান করছে এপারে। বুনো মহিষের তাড়া খাবার আতঙ্ক আছে মনে—ভয়চকিত দৃষ্টি। স্বভাবভীতু সম্বরকুলও জল খেতে আসে ওপারে। ডাগর ডোগর দুটি কালো চোখের মায়াদৃষ্টি মেলে মন্ত্রমুগ্ধ করে এপারের মানুষকে।

আরণ্যকেরা আছে বলেই তো অরণ্য। নইলে উপত্যকার আঙিনাখানিকে ভরে বর্ণাঢ্য মরশুমী ফুলের আলিম্পন ভাল লাগত ঠিকই। তবে রঙবাহারী ফসলের উচ্ছ্বাসে শস্যচিত্রিত সবুজ বন—সে তো মাত্র বর্ণালী ফ্রেমে বাঁধানো এক সবুজ লিপিকা। সেই মনমাতানো দৃশ্যপটে আসর জাঁকিয়ে কোন এক বিস্মৃত আদিমকাল থেকে একটানা অভিনয় করে চলেছে যারা, তাদের জীবন-নাট্যকেই দেখতে চেয়েছি দুচোখ মেলে। যা দেখেছি তাই বলবো—মহাভারতের আর এক মুখর অরণ্যকাণ্ড। 'বন্যেরা বনে সুন্দর'—এমন কথা লিখলেন যিনি, তিনি শুধু নিরাসক্ত লেখক নন, তিনি কবি। অরণ্যসুন্দরকে প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি। কিন্তু বহিরঙ্গের রূপটাই তো একমাত্র কথা নয়। তার অন্তরঙ্গের আছে সুখ

দুঃখের কত কাহিনী, কত নিভৃত কানাকানি। একটা অখণ্ড জগৎজোড়া সমাজ। সেখানেও আছে অলিখিত আইন কানুন, আছে মায়ের স্নেহ, আছে প্রণয়ের দ্বন্দ্ব, ব্যক্তি-জীবনের ছোটখাটো ব্যথাবেদনার কাহিনী। প্রকৃতির তাগিদে ওরাও গড়ে সংসার। জীবন সংগ্রামে মেয়ে পুরুষ মিলে এক সাথে যোগাড় করেছে আহারের অন্ন। গোটা সংসারটাকে ভাগ করে দিয়েছে সে আহার—এ তো হামেশাই চোখে পড়েছে আমার।

সুন্দরবনের সাথেই আমার সম্পর্কটা কিছু বেশি—এমন কথা হয়তো মনে হবে অপরের। আর তা' হবারই কথা। কৈশোর ও যৌবনের নিত্যসঙ্গী হিসেবে পেয়েছি দুনিয়ার এক সেরা অরণ্য-ভূমিকে। ওর বন্য পরিবেশে লালিত হয়েছি ওরই কোলে। তাই ওকে পরমাত্মীয় বলেই মেনে নিয়েছে মন। ওর আরণ্যকদের আজও মনে হয় বড় আপন। ভাগ্যের ফেরে আজ না হয় ছন্নছাড়া। কিন্তু ওর অন্দরমহলে যে আসন পেয়েছি একদিন, সে তো শুধু বরাতগুণেই। রামায়ণের রামচন্দ্র পিতৃসত্য রক্ষার জন্যে পিতাকে ছেড়ে বনে গিয়েছিলেন শুনেছি। বরাতগুণে বাবার হাত ধরেই আমি গেলুম বনে। আপন ঘরের ক্ষুদ্র গণ্ডী ছেড়ে আমি যেন পা দিলুম বিশ্বস্রষ্টার বিরাট সংসারে। রামচন্দ্রের সাথে ছিলেন সীতাদেবী, আর সাথী অনুজ লক্ষ্মণ। সীতাদেবীর মত বনসঙ্গিনী হবার রেওয়াজ নেই একালে। তবে অরণ্যের রোমান্সটাকে আয়ত্ত করবার লোভে মাঝে মাঝে সঙ্গিনী যে জুটতোনা এমন নয়। কিন্তু সে কথা এখন থাক। বলতে যাচ্ছিলুম অনুজ লক্ষ্মণের প্রহরা দুর্ভেদ্য ছিল না। বরাতগুণে আমাকে পাহারা দিতে আমি পেয়েছিলুম কালী কপালী আর ময়না শিকারীকে। তবে ওরা আমার অনুজ নয়, বরং বলি অগ্রজ। ময়না শিকারী বাবার চাইতে বয়সে কিছু ছোট হবে হয়তো। ছোটবেলায় তাই অবাক হয়ে ভাবতুম, আমার বাবাকে ময়না কেন আমার মত করেই বাবা

বলে ডাকবে। বড় হয়ে বুঝেছিলুম আমার বাবা-মায়ের চোখে আমি ময়না শিকারীর অনুজ মাত্র। অমন অগ্রজ সঙ্গে আছে বলেই সুন্দরবনের বাঘের মুখেও ওঁরা ছেড়ে দিতে পারেন আমাকে। বেদবাক্যের চাইতেও বোধ হয় বাবা বেশি করে বিশ্বাস করতেন যে ময়না শিকারী জান দেবে তবু জবান ছাড়বেনা।

আর কালী কপালী! আমার মাকে হাসতে হাসতে কালী বলতো, 'ভায়ের জন্যে ভয় কর কেন মা? আমি তো সঙ্গে যাই। যম আসলেও আমি গলা টিপে ধরবো।'

আমার মা তাঁর এই সাত ফুট লম্বা অসুর আকারের ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বুকে বল পেতেন ঠিকই। কিন্তু আমার বল-বুদ্ধির উপর বিন্দুমাত্র আস্থা ছিলনা তাঁর। তাই কালীর কথাতেও মন মানতো কিনা কিজানি! কালী কিন্তু মিথ্যে বড়াই যে করেনি সেকথাও তো বোঝে সবাই।

ময়না শিকারীর শেষ দিনটাকে চোখে দেখিনি আমি। কিন্তু আজও চোখের সুমুখে স্পষ্ট হয়ে আছে আর একটি ভয়ংকর দিনের ছবি। প্রমাণ হয়ে গেল সেদিন ভাগ্যের উপর হাত নেই কারো, আর মারণাস্ত্র আছে বলেই মানুষ অপরাজেয় নয় এই অরণ্যরাজ্যে। সংক্ষেপে শুনিয়ে যাই ঘটনাটি, ঘটনা নয় দুর্ঘটনা। কদিন ধরে সখ হয়েছে আমার বেড়াজালে বন্দী করে আনবো ফুটফুটে চেহারার ছোট্ট একটি হরিণশিশু। পুষবো তাকে পরম যত্নে, লালন করবো মায়ের স্নেহে, পিতার মমতায়। চেষ্টাও করেছি বড় কম নয়। কিন্তু বাঘের বাচ্চা বন্দী করা বরং সম্ভব, হরিণী মায়ের প্রহরা ভেদ করে তার শিশুকে চুরি করতে পারে এমন সিঁধেল চোর আছে কে? ফন্দী এঁটে আজ তাই সাতসকালেই এসে হাজির হয়েছি আমরা। যূথের উপর চোখ রেখে চলেছি সুবিধে মত একটা ব্যূহ রচনার অপেক্ষায়। অমাবস্যার জোয়ার আসবে ভর-দুপুরে। জোয়ারের জলে ডুবে যাবে জলাভূমি। ছোট ছোট

দ্বীপপুঞ্জের মত এখানে ওখানে মাথা উঁচিয়ে থাকবে মাটির ঢিপি। আরণ্যকের দল আশ্রয় নেবে সেই আরাম-আস্তানায়। ব্যূহ রচনা করে বেড়াজালে বন্দী করবো তখন—এঁটেছি সেই ফন্দী। জ্যা-টানা ধনুকের তীরের মত ওদের গতি। তবু ভরসা এই, সদ্যোজাত কেউ থাকে যদি যূথমধ্যে, নিতান্তই কোন দুধে-বাচ্চা।

দুপুরের দিকে চেয়ে পল গুণছি, অদূরের এক দোনলা বন্দুকের আওয়াজ এলো কানে। দেড় ডজন আন্দাজ হরিণ-হরিণীর একটি যূথের উপর এতক্ষণ চোখ রেখেছিলুম অনেক মেহনত করে। পলকপাতে উধাও হলো ওরা। ব্যস্ত হয়ে ওঠে ময়না শিকারী। বাঘের আস্তানায় বন্দুক পেতে রেখে এসেছে সে। গুলির আওয়াজটা তো এলো ঠিক সেখান থেকেই। ময়নার কি এখন চুপ করে থাকা চলে? তাই হন্তদন্ত হয়ে ছুটলো ময়না। সঙ্গে চললো শুধু ময়নার বড় ছেলে—অর্জুনের সঙ্গে অভিমন্যু যেন। আমরাও পা বাড়াই ওদের পেছু পেছু। বাঘ না হোক, শিকার একটা পাওয়া যাবে সম্ভবত। মৃত না হোক, আহত। বন্দুক পেতে রেখেই বাঘ মারে ময়না—এটা তার এক কৌশল। শিকার যদি শুধু ঘায়েল হয়ে থাকে তাহলে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাবার আগেই শমনের সনদ হাতে নিয়ে হাজির হয় ময়না। অভ্রান্ত ওর আন্দাজ, অব্যর্থ ওর আঘাত। আর সব চাইতে বড় কথা এই যে ময়না মরদ। সুন্দরবনের বাঘের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওর হাত কাঁপে না। ক্রুদ্ধ শার্দুলের হিংস্র গর্জনে অরণ্যরাজ্যে একটা ওলটপালট ঘটে যায় —ভূমিকম্পের পৃথিবী যেন। ময়নার লক্ষ্য টলেনা কিন্তু একটুও।

যাক সে কথা। বেশ কিছুটা এগিয়ে এসেছি হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় কালী। বাঘের গায়ের গন্ধ পেয়েছে সে। কালীর তাগিদে গাছে চড়ে বসতে হলো আমাকে। হাতের বর্শাটাকে শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে মাটিতে দাঁড়িয়ে কালী। হয়তো ভাবছে সে আমাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলা আর উচিত কিনা। হঠাৎ আবার একজোড়া

গুলির আওয়াজে গম্‌গম্ করে উঠলো গোটা বনটা। শব্দ-তরঙ্গ প্রতিধ্বনি তুলে তখনও পাক খেয়ে মরছে ঝাঁকড়া গাছের ডালে পাতায়। এত্তেলা এলো এমন সময়—ময়নার বড় ছেলের গলা। কণ্ঠস্বরে এমনি এত্তেলা বা ডাক পাঠিয়ে বনের গভীরে অবস্থানের নির্দেশ করে মানুষ। আবার এলো সেই ডাক—আবার—আবার। কণ্ঠস্বরে কেমন একটা অলক্ষুণে কাঁপুনি। এ তো অবস্থানের সংকেত নয়—এ যে অর্থপূর্ণ এক ভীষণ ইঙ্গিত। এমন বেসুরো এত্তেলা তো শুনিনি এর আগে। হাতের হাতিয়ার বাগিয়ে ধরে হুঁসিয়ার হয়ে চলি আবার। কাছে আসতেই ময়নার বড় ছেলেটা ককিয়ে কেঁদে ওঠে, 'হুঁজুর, বাপজানকে ধরে নিয়ে গেছে বড় শেয়ালে'। ময়নার মত শিকারীকে বাঘে ধরে নিয়ে গেছে—কথাটা যেন চাবুকের মত কেটে বসল মনে। অজানা আশঙ্কায় আঁৎকে উঠলো আমার পৌরুষের অহংকার। আমাকে গাছে বসিয়ে রাখতে চায় কালী কপালী। ময়নাকে মুখে করে টেনে নিয়ে যেতে দেখেছে ওর ছেলে। কিন্তু কোথায় যে সে গা-ঢাকা দিয়ে আছে কে জানে। অবিশ্যি নিকটেই সে আছে কোথাও। খুব বেশি দূরে শিকারকে টেনে নিয়ে যাওয়া সহজ নয়, ওর স্বভাবও নয়। কেউ জানেনা কোন্ অদৃশ্য আড়াল থেকে আবার সে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কালীর তাগিদে গাছের উপরেই চড়ে বসতুম হয়তো। অজেয় ময়না। দীর্ঘ বিশ বছর ধরে সে অপরাজেয়। তার এই পরিণাম তো স্বপ্নেও ভাবতে পারিনা আমরা।

সঙ্গের মাঝিমাল্লারা তাই ভয়ে গাছে উঠতে চায় সবাই। দেবতা দক্ষিণরায়ের আশীর্বাদে ময়নার হত্যাকারী আজ অমিত শক্তিধর নিশ্চয়। তার কাছে মানুষ তো হাতির কাছে ফেউ যেন। এমন বোকার মত নিশ্চিত মরণের মুখে এগিয়ে যাবে কে? মাটিতে দাঁড়িয়ে তখনও আমি। ময়নার ছেলে গাদা বন্দুক হাতে আমার বাঁয়ে দাঁড়িয়ে। অঝোরে দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে তার।

বাপজানের অবর্তমানে আমাকে পাহারা দিচ্ছে সে। ডাইনে দাঁড়িয়ে কালী কপালী। কোমরের দুপাশে বাঁধা তার বিরাট আকারের দুটো টাঙ্গি। এক হাতে প্রকাণ্ড একটা বর্শা, আর হাতে হালকা গোছের একটা সড়কি। কাঁধের সেই পাঁচহাতি হরধনু সে তুলে দিয়েছে নৈমুদ্দীর হাতে। ধনুকের সাথে তীরভরা তূণও। চেয়ে দেখি কালীকে। অমনটি বোধ হয় আর কখনও দেখিনি তাকে। ইস্পাতের মত সোজা শক্ত তার লৌহকঠিন দেহ। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার সাতফুট দেহটা জুড়ে বলের মত নেচে বেড়াচ্ছে অগুণতি ইস্পাত-কঠিন পেশী। লাল জবাফুলের মত একজোড়া হিংস্র চোখ রণরঙ্গে উল্লসিত। কালী জানে হত্যাকারীর সাথে লড়াইটা এবার হাতাহাতি। তাই আমাকে নিরাপদ দূরত্বে রাখবার জন্যে এত ব্যগ্র সে। দুহাত বাড়িয়ে মাথার উপর উঁচু করে তুললে আমাকে গাছে চড়িয়ে দেবার জন্যে। হঠাৎ আবার বন্দুকের আওয়াজ। খুব কাছেই কোথাও গুলি ছুঁড়লে কেউ। কালী মাটিতে নামিয়ে দিলে আমাকে। এতক্ষণ মাটিতে দাঁড়িয়ে পা দুটো আমার মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল ভয়ে, এবার যেন মাটির উপর কায়েম হয়ে দাঁড়াল তারা। কঠিন তার ভঙ্গি। যে মন একটু আগে কেঁচোর কত গুটিয়ে আসছিল ভয়ে, এবার যেন সে ফণা তুলে ফোঁস্‌ফোঁস্ করতে থাকে কালনাগিনীর ক্রোধে। নিজের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠি আমি নিজেই—এ আবার কোন রূপান্তর! আমি যে সত্যিই ময়নার অনুজ। অপরাজেয় অগ্রজের দুর্জয় অনুজ আমি। গুলির শব্দ নিশানা করে চলি আমরা। ময়নার ছেলে জোর করে ঠেলে দেয় আমাকে ওদের দুজনের মাঝখানে আর মাঝে মাঝে হুঁসিয়ারী জানিয়ে বলে, 'একটু হিসেব করে কাজ কোরো চাচা।' রক্তের দাগ দেখে বুঝি পথের নিশানা। মস্ত বড় ক'টি গাছের গুঁড়ি ছড়িয়ে আছে মাটিতে। পাশেই তার গোলবন। গুঁড়ির ফাঁকে

ময়নার ফতুয়া চোখে পড়লো। সম্ভবত মানুষের সাড়া পেয়ে ময়নার হত্যাকারী নিঃসাড়ে সরে পড়েছে—গা ঢাকা দিয়ে আছে গোলবনের ভেতরে। না-না, ঐতো ময়না শিকারী রক্তে-ভেজা মাটির কাদায় ঘুমিয়ে আছে। আর ওরই বুকে মাথা রেখে চিরনিদ্রায় ঢলে পড়েছে ওর হিংস্র হত্যাকারী—বিশাল দেহ বর্ণালী বসনের সজ্জায় চোখ জুড়ানো চেহারার বাঘ—অরণ্য রাজ্যের রাজ-অধিরাজ। কণ্ঠনলী ফুঁড়ে একজোড়া গুলি বেরিয়ে গেছে কপাল কেটে। ময়নার গায়ের ওপরেই পড়ে আছে ওর বন্দুকটা। এই দোনলা থেকেই গুলি ছুটেছে এক্ষুনি। ময়নার জীবনটা ধুকধুক করছে তখনও। বাঁ হাতের কুনুইটাকে ভাঁজ করে সে সজোরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল বাঘের গালের মধ্যে। ময়নার মাথাটা তাই বেঁচে গেছে বোধ হয়। শুধু মুখের মধ্যে হাতটাকে চিবিয়ে হাড়গুলোকে চুরমার করে ভেঙে দিয়েছে সে।

এর পরের যে কাহিনী তার পরিচয় দিয়ে গল্পের পরিধি বাড়িয়ে লাভ কি? সে তো সহজেই অনুমেয়। তিরিশ দাঁড়ির ছিপ ছুটলো কাছারি থেকে। লড়াই লাগলো এবার যমের সাথে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের। ফল কি হল জানতে আগ্রহ হচ্ছে আপনার? আপনার জিজ্ঞাসার জবাব দেবো বলে আমিও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। কিন্তু তার আগে আমার কিছু জিজ্ঞাসা করতে সখ হচ্ছে যে। ময়নার জন্যে আপনার মন কেমন করছে না? গোটা আবাদী এলাকা জুড়ে হিন্দুরা সেদিন ময়নার প্রাণভিক্ষা করেছিল মন্দিরে মন্দিরে। মুসলমানেরা নামাজ পড়েছিল মসজিদে। হিন্দু মুসলমান সবাই মিলে সিন্নি মানত করেছিল পীরের দরগায়। শিকারীরা একজোটে ভেট চড়িয়েছিল ব্যাঘ্রদেব দক্ষিণরায়ের দাক্ষিণ্য ভিক্ষা করে। এত কাণ্ড কেন জানেন? ময়নার বাহুবলে আবাদী এলাকার আবহাওয়ায় ছিল নিরাপত্তার আশ্বাস। ময়নার পরাজয় যেন গোটা আবাদী-পৌরুষের পরাজয়। ময়না তাই

মরেনি সেদিন। অস্ত্রোপচারে বাদ পড়ে গেল অর্ধেক বাহু সমেত বাঁ হাতখানি। তবু সে হার মানেনি নিয়তির কাছে। বাকি জীবনটাও তার কম কর্মচঞ্চল ছিল না।

হ্যাঁ, হরিণশিশুর কথা। ভরতমুনির মায়া পড়েছিল এক মৃগশিশুর উপরে। সারা জীবনের সঞ্চিত পুণ্যবলও বরবাদ হয়ে গেল মৃগের মায়ায়। কোনদিন যদি ওর পটল চেরা চোখ দুটিকে দেখে থাকেন তাহলে আপনিও বুঝবেন মানবীর চাইতে কত বেশি রঙ্গ জানে ওর ঐ তুলি আঁকা চোখদুটি—কি দুর্বার আকর্ষণ ওর চোখের চাহনিতে।

কিন্তু প্রকৃতির রঙ্গ বোঝে সাধ্যি কার? মানুষের স্বভাবে বৈচিত্র্য কি কিছু কম! মানুষের এই মাটিতেও তো এমন অনেক ঘটে যা বাঁধাধরা নিয়মকানুনে বাঁধা পড়েনা বা বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলেনা। সুন্দরবনের বাঘ যদি আপনার বাড়িতে এসে অতিথি হতে চায় তাহলে আশ্চর্য হতে হয় বৈকি! কিন্তু ব্যাঘ্র-অতিথির জন্যে পিঁড়ি পেতে কিংবা বাটা ভরে পান সেজে বসে থাকার কথা নয় আমার আপনার। এতবড় একটা অঘটনকে আশা করিনি আমিও। তবুও ঘটে গেল। তবে অতিথি হয়ে যিনি এলেন তিনি নিতান্তই একটা হরিণশিশু। সারাদিন পরে পড়ন্ত বিকেলে কাছারিতে ফিরে চলেছি আমরা। একটা কাস্তে-চোরা পাখিও পাইনি বন্দুকের ডগায়—নিতান্তই একটা আটপৌরে নির্জীব দিন। আট ঘণ্টা সুন্দরবনের গহনে পাড়ি জমিয়ে ফিরে যাচ্ছি—অথচ বন্দুকের একটি গুলিও খরচ হয়নি। কথাটা ভাবতেই মেজাজটাও তিরিক্ষি হয়ে ওঠে তক্ষুনি। এই খালটা বেয়ে আর আধঘণ্টার মধ্যেই নদীতে গিয়ে পড়ব আমরা।

ওপারে কাছারি। নিষ্ফল একটা দিন। কাছারির পাঠক সিং আর রূপো বরকন্দাজ ভাববে যে খোকাবাবুর হাত এখনও রপ্ত হয়নি হত্যায়। হাতের তাগ ঠিক হয়নি এখনও। কথাটা

মগজে সেঁধুতেই মনটাও মরিয়া হয়ে ওঠে। সন্ধানী দৃষ্টি মেলে খুঁজে মরি কোন শিকার। নৌকা চলেছে তরতর করে, হঠাৎ যেন মনে হলো পাতার ফাঁকে একজোড়া ফুটকি-দেওয়া কান। অনুমানে নির্ভর করে ট্রিগার টেনে দিলুম। সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে আচমকা ছুটলো আমার গুলি। পাতার আড়াল থেকে দিনের নিভন্ত আলোতে ছুটে এলো একটা হরিণী। মাত্র কয়েক পা। তারপর মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে বার দুই ডাকল 'ব্যা-ব্যা'। মায়ের ডাকে সাড়া দিলে শিশু। ধীরপদে এগিয়ে এলো ওর মায়ের কাছে। মায়ের রক্তমাখা মুখটা চাটলে কয়েকবার। তারপর চোখ তুলে চাইলে আমার দিকে আর কাতর কণ্ঠে বললে শুধু, 'ব্যা-এ্যা-এ্যা'।

শিউরে উঠলুম ওর কণ্ঠস্বরে। ভয়ে বুকের ভেতরটা কাঠ হয়ে গেল। সন্তানের সুমুখে হত্যা করেছি মাকে। হরিণশিশু আবার ডাকে 'ব্যা'। আমার কানে বাজতে থাকে বাল্মীকির সেই চিরন্তন অভিশাপ-বাণী। শিশুটি গুটিগুটি এগিয়ে আসছে আমার দিকে। ও বুঝি এক্ষুনি আমাকে ভর্ৎসনা করবে! হরিণ-শিশু এগিয়ে আসছে তো আসছেই। ভয় পেয়ে পালাতে চাই। চীৎকার করে বলি নৌকার নোঙর তুলতে। ময়না বোঝেনা আমি কেন পালাতে চাই। এই নিরীহ শাবকটিকে আমার এত ভয় কিসের? শাবকটি এগিয়ে এসেছে ডিঙির কাছে। কাতর দৃষ্টি মেলে থমকে দাঁড়িয়ে আবার ডাকলে, 'ব্যা-এ্যা-এ্যা'। ও বুঝি বলছে আমি নির্মম ঘাতক। বলছে, 'তোমার তো গুলির অভাব নেই! আমাকেও তুমি হত্যা কর, ঘাতক! মা ছাড়া কি বাচ্চা বাঁচে? তুমি দয়া করে মার কাছেই আমাকে পাঠিয়ে দাও।'

হাতের বন্দুক হাত থেকে খসে পড়ে। দুহাতে চোখ ঢেকে চেঁচিয়ে উঠি, 'নোঙর তোল নৌকার'। ছোট্ট ডিঙি ভাটার টানে ছোটে নদীর বুকে। পালিয়ে বেঁচেছি ভেবে আশ্বস্ত হয়ে চোখ খুলি।

কালী কপালী মুচকি হেসে শিশুটাকে তুলে দেয় আমার কোলে। হত্যা করে হাসতে পারিনি আর এর পরে। নিজের মনটাকে হাতড়ে দেখি। এই বড় মজা যে নিজের মনের নাগাল পাইনি আমি কোনদিনও। ভয় পাইনা এমন সাহসী আমি নই। মজা এই যে ভয় যেখানে ভয়ংকর, ভয় পেলাম না সেখানে। ভয় যখন এসেছে মনে তখন সে এসেছে নিতান্ত অকারণে। নিজের মনে মনেই হাসি পায় আজ। এ কি বিদ্‌ঘুটে কোনো যাদুর মায়া না, অরণ্যদেবের বিচিত্র লীলা। এরই নাম বুঝি অরণ্য-আলেয়া।

দুই

জঙ্গলের চোখে আছে মায়া কাজল—জংলীর চোখেও। জঙ্গলে যারা যায় শুধু জীব-হননের চেষ্টায় তারা মাকড়সার মতো ফাঁদ পাতে, শেয়ালের মতো ফন্দী আঁটে, চিতার চাতুর্য অনুশীলন করে কিংবা হায়েনার মতো অতি সাবধানী দৃষ্টি নিয়ে বিব্রত থাকে নিছক আত্মরক্ষার তাগিদে। আত্মরক্ষার প্রয়াস যতখানি স্বাভাবিক, অযথা হত্যার লিপ্সাও ততখানি অস্বাভাবিক। মানুষের গায়ে জোর আছে সত্যি, তবে সে জোরের দাপটে বাঘ কেন বরাহের সাথেও এঁটে ওঠা যায় না। মানুষের মগজে ফন্দী-ফিকিরের অভাব নেই, তবে তা দিয়ে চিতার চাতুরীকেও হার মানানো যায় না। মানুষ বড় হুঁসিয়ার, তবে বোকা সম্বরের চাইতে বেশি সজাগ সে নয়। শিকারীর কবল থেকে শিকার ফস্‌কে গেলে মানুষের জিদ বাড়ে, তবে বনকুকুরের বেপরোয় জিদ নেই তার। তবু যে মানুষ বনের বাসিন্দাকে বেহেস্তের পথে এগিয়ে দিচ্ছে, সে তার অব্যর্থ অস্ত্রের জোরেই সম্ভব হচ্ছে শুধু। বুনো হাতিও তার হাতিয়ারের কাছে কিছু নয়। চতুষ্পদের রক্ষাকবচ তার সহজাত স্বভাব। দ্বিপদী

মানুষ চলাফেরার কাজটাকে দুপায়ে সেরে নিয়ে আর দুটো পা-কে হালকা করে তাকে আকারে ক্ষুদ্র করেছে বটে, তবে সেই হাতদুটোই তো তাকে সবার উপর সুবিধে দিয়েছে। মানুষের মগজ তাকে মারণাস্ত্রের সম্রাট বানিয়েছে সত্যি, কিন্তু ওর সর্বনেশে হাত দুটোই তো সেই মৃত্যুবাণের চালক। মানুষ পশুর চাইতে বুদ্ধিতে খুব খাটো নয়। বিচার শক্তিতে তার জোড়া নেই জল স্থল বা অন্তরীক্ষচারীদের জগতে। হাত আছে তাই হনন করা হয়তো সবার পক্ষে সম্ভব, কিন্তু চোখ থাকলেই দেখা যায় এমন কথা কেউ হলপ করে বলবে না। শিকারের সন্ধানে পথ তাকিয়ে যার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো; জঙ্গলের জলার উপর শিকারের পায়ের ছাপের তল্লাসীতে যে দৃষ্টি খুইয়ে বসলো, ঝোপঝাড়ের কাঁটা উঁচানো বেষ্টনীতে যার দৃষ্টি বিঁধে রইলো বাণবিদ্ধ ক্রৌঞ্চের মতো, বনের বহিরঙ্গ তার নখদর্পণে বটে, কিন্তু অন্তরঙ্গ হবার মতো আত্মীয়তা আসবে কোত্থেকে?

বনেরও রূপ আছে—বন্য সুন্দর রূপ। সে রূপ আদি থেকে অনাদিকালের সীমা পর্যন্ত ছায়া বিছিয়ে দেয়—অনন্তের ছায়া। তার রূপে চিরসুন্দরের আগুন, তার পাতার ফাঁকে ডালের দোলায় বসন্তের ফাগ আর মাধুরী মিলিয়ে চিরজাগ্রত ফাগুন। সমুদ্রগর্ভের মত অতলস্পর্শী ওর রূপ, নীলাকাশের রহস্যময়তা ওর আবরণে। ওর শাল মহুয়ার বনে বনে আকাশের নিঃসঙ্গ চাঁদ শত লক্ষ হয়ে লীলায় মেতে ওঠে। ভালুক-মা তার কোলের কচি-কাঁচা নিয়ে মহুয়ার ডালে ডালে দোল খায়। কর্তা তখন মহুয়ার মদে মাতাল হয়ে আকাশের চাঁদের সাথে রঙ্গতামাসা করে। পাহাড়ী জঙ্গলের টুকরো ফালিতেই চাঁদের খেলা জমে ভাল। নিচেকার উপত্যকায় তখন আলো আঁধারের আলেয়া। আর ঝরনার জলে পা ডুবিয়ে শত খণ্ডে সাদা চাঁদ তখন পাথর থেকে পাথরে পা বাড়িয়ে চলেছে তো চলেছেই।

পাহাড়ী বনের কথা এখন থাক। সে তো কথা নয়—চিরন্তন

কাব্য। সুন্দরবনের জলা জঙ্গলেও রাতের রূপ অমনি মোহময়, চাঁদের মায়া অমনি স্বপ্নময়। তবে প্রকৃতি সেখানে পাষাণপুরীর প্রাসাদমর্মরে উর্বশীর মত নেচে চলে না, লক্ষ্মীর মত সে সংযত। বনের একহাঁটু কাদায় আটকে পড়ার ভয়ে আকাশের জ্যোৎস্না আর জঙ্গলের জোনাকী দুই-ই যেন ভারী হুঁশিয়ার। দুপাশের সারিবন্দী গাছের তল দিয়ে ছুটে চলেছে এক একটা আঁকাবাঁকা জলের রেখা —ওর অজস্র ঘোলা জলের খাল। অজগরের মত দেহের বিস্তৃতির অভাব অযথা দৈর্ঘ্যের তলে ঢাকা পড়েছে। বাঁকের মাথায় গরাণ গাছের অন্ধকারতলে মৃত্যু ছিল মুখব্যাদান করে। আমাদের ছোট্ট ডিঙিটা ডুবো গাছের গায়ের উপর চেপে উলটে গেল যখন তখন ওকে লক্ষ্য করতেই পারিনি। ঝুপ করে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়তেই দেখলুম ওর লম্বা চোয়াল, ধারালো দাঁত, শক্ত মাড়ি, কুৎসিৎ তেলকুচকুচে গা, একটিবার মাত্র দেখতে পেলুম ওর মস্ত হাঁ-করা মুখ—নরকের সিংহদ্বার যেন।

যাক, মাচানে চড়ে এবার একটু আড়মোড়া ভেঙে নিইতো। আজ আমি এই প্রথম গোধূলি লগ্নে বনদেবীকে ঘোমটা টেনে দিতে দেখছি। বাসর রাত তো জেগেই কাটবে জানি। মাচানে বসে চাঁদের মুখ দেখতে পেলুম না বটে, তবে কোথাও না কোথাও একফালি চাঁদ উঠেছে বৈকি। বনমোরগেরা বাসায় ফিরে এসেছে। একটি তো একেবারে উড়ে এসে বসলো আমার পাশের ডালটাতে— 'কু-রু-র-কু-কু-উকু'। হেঁড়ে গলায় তীক্ষ্ণ কর্কশ চীৎকার—কয়েকবার তার দীর্ঘ পাখার ঝাপট। কয়েকবার চঞ্চু দিয়ে দেহটাকে সাফ করে নিল, তারপর যে রংবাহারী তরুণীটি এসে হাজির হলো তার কাছে তাকেও চঞ্চুঘাত করে সে স্থির হলো সারা রাত্রির জন্যে। কুক্কুট গৃহিণীর সাথে কচিকাঁচা অনেকগুলো। অতি কৌতূহলী দু'একটি শিশু আগার ডালে চড়ে বসতেই ওদের জননীর তিরস্কার শোনা গেল— 'ক্যা-ক্যা-ক্যা-কুউ'। মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ কঠিন ভর্ৎসনা। শিশুটি নেমে

এলো নিচের ডালে। হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে পারি বোধ হয়।

'টিউ-টিউ'—লম্বা ঘাসের ঝোপ থেকে গলা বাড়িয়ে ডাকল এক সুশ্রী সম্বরী। ঝোপের আঁধার-কালো আড়াল থেকে রাজকীয় চালে কয়েক পা এগিয়ে এলো বেশ জাঁদরেল গোছের একটি সম্বর। গলা বাড়িয়ে সে এদিক ওদিক চেয়ে দেখল, কান খাড়া করে বনের নাড়ীর স্পন্দন গুণে নিল যেন। সম্বরী আবার ডাকে, 'টিউ-টিউ-টিউ'। বোধ হয় সম্বরী কি বলছে দলাধিপতি সম্বরকে। সম্বর নড়ল না দেখে সম্বরী এগিয়ে আসে কয়েক পা। সম্বরীকে ঘিরে এখন একপাল হরিণ-হরিণী। বেশ সুশ্রী শক্তিমান চেহারার এক ছোকরা-সম্বর সম্বরীর গায়ে ঠেস দিতেই দলপতি শিং বাঁকিয়ে তেড়ে আসে। ঠক ঠক—শিংএর গায়ে শিং বাজলো। ছোকরা পেছু হটতে বাধ্য হলো। দলের চলাও শুরু হলো। সম্বরী-যূথ-শোভিত দলপতি চলছেন গজেন্দ্র গমনে। মায়ের পাশে টগবগিয়ে চলেছে শিশুরা। এক কুড়ি সুন্দরী বেগম পরিবৃতা মোঘলশাহী যুগের কোন সৌখিন বাদশা চলেছে যেন। যে ছোকরাটি একটু আগে প্রধানা বেগমের সাথে ভাব জমাবার চেষ্টা করেছিল তার সঙ্গেও আর এক দফা বোঝাপড়া করতে হলো বাদশাকে। ভর্ৎসনা করতে হলো একটি তরুণী বেগমকে। ঐ অবাধ্য ছোকরার প্রতি তরুণীর আকর্ষণটা যেন একটু বেশি রকমের। চলতে চলতে ওরা আমাদেরই গাছের তল দিয়ে চলে গেল অন্ধকারের আড়ালে।

'হা-আ-উ'—গম্ভীর চাপা আওয়াজ। ক্রোধ নয়, বিরক্তি নয়। গভীর নিদ্রার পরে ঘুম ভেঙে একটু আড়মোড়া ভেঙে-নেওয়া, একটানা আমেজে ক্ষুদ্র একটি হাই তোলা মাত্র। তাও অনেক দূরে—কয়েক মাইলের ব্যবধান তো বটেই। বন যেন এতেই বাঙ্ময় হয়ে উঠল। কুশের এলাকার পরেই যে খালটা এতক্ষণ নজরে পড়ছিল তারই তীরে বোধ হয় জল খেতে এসেছিল একদল ডোরাকাটা হরিণ-হরিণী। ওদের দলপতিকে দেখলুম বিদ্যুৎগতিতে

দশ-বিশ হাত পরিধির একটা ঝোপকে বেড় দিয়ে ঘুরতে। তারপর দলবল নিয়ে সে যে কোন পথে গেল। দূরের পথে বুঝিবা।

ঘুম আসছিল চোখের পাতায়—ঘুমিয়ে পড়তুমও। কিন্তু দু'চোখ ভরে বনকে দেখেও যেন প্রাণের তৃষ্ণা মিটছে না। আকাশের চাঁদকে দেখলুম বনদেবীর জরির আঁচলের রুপোলী পাড়টা হাতের মুঠিতে চেপে ধরে কতই না সাধ্য-সাধনা করে মরছে সে। নায়িকার মান ভাঙলো যদি-তো শুরু হলো নায়কের সাথে লুকোচুরি খেলা। লতার বেড়ায় পাতার ঝিলমিলিতে সারা বন ভুবন জুড়ে মায়ার ফাঁদ। মেঘ এসে চাঁদকে ঢাকল একসময়। বোরখার আড়ালে মুখ ঢাকল বনলক্ষ্মী, তৃষ্ণার্ত চোখ দুটির বাইরে আসবার জন্যে কি অসহিষ্ণু প্রয়াস। চলমান মেঘ চাঁদের রাজ্য পেরিয়ে আবার পাড়ি জমাল তেপান্তরের মাঠে। গাছের আগডালে দোলনায় দুলতে দুলতে ঘুমচ্ছিল কাকের ছানা। তাদেরই একটা কা-কা করে উঠল তো একসঙ্গে বোধ হয় একলাখ কাক চেঁচিয়ে একেবারে বন মাথায় করে তুলল। আচমকা এমনি কুৎসিৎ কোরাস শুনে সোজা সজাগ হয়ে বসলুম। ময়না শিকারী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, 'ও কিচ্ছু নয়। জোছনার আলোকে ওরা ভোর ভেবেছে।'

'খ্যাক্-খ্যাক্-খ্যাক্'—মুখে শব্দ করেই ওরা ক্ষান্ত হল না। প্রবল বেগে দু'চারটে ডাল নাড়া দিয়ে বানরকুল কাকবংশকে বেশ একটা ধমক দিল। ধমক খেয়ে কাকেরা বেশ লক্ষ্মী ছেলের মত চুপটি করে বসে রইল। আমিও একটু হাত পা ছড়িয়ে দিলুম। গাছে যখন কাক আর বানরকুল আস্তানা নিয়েছে, বনমোরগ দম্পতিরা যখন ডালে ডালে সংসার সাজিয়ে আছে, তখন আর যা হোক সাপের উৎপাতটা নেই। আর ভয়? মাচানের নিচের ডালে কালী কপালী আর মাচানের প্রবেশ পথে ময়না শিকারী আছে আমার পাহারায়। বাঘিনীর কোল থেকে বাচ্চা কেড়ে এনেছি আমরা, কিন্তু কালীর প্রহরা ভেদ করে বাঘিনী একটা আঁচড়ও দিতে পারেনি

আমার দেহে। আর ময়না! আমাকে বাঁচাতে সে জান দেবে তবু জবান তার নড়বে না। কিন্তু যাক সে কথা। এমন একটানা শব্দহীন ভাবটাও ভালো লাগে কতক্ষণইবা! 'ছড়-ছড়-ছড়'—চমকে উঠলুম, তন্দ্রা ছুটে গেল চোখ থেকে। না—কিচ্ছু নয়। আমার কোলের উপর লাফিয়ে পড়েছিল দুটো কাঠবেড়াল কাঠবেড়ালী। গাছের তলে শব্দ হল 'ছুট্-ছুট্'। ধবধবে সাদা খরগোস দম্পতি। পেছনে ওদের ছোট্ট ছানাটি লাফিয়ে চলেছে।

আবার সেই একটানা দীর্ঘ প্রতীক্ষা। খর-র খ-র-র—শব্দ যেন থামতেই চায় না। মুখ বাড়িয়ে দেখি আলালের ঘরের দুলালের মত বেশ তেল কুচকুচে নাদুস-নুদুস চেহারার একটি সজারু। গাছের গুঁড়িতে গায়ের কাঁটা শানিয়ে নিচ্ছে। সজারু—ঐটুকু তো নগণ্য জীব! তা বলে রয়ালবেঙ্গল মহারাজও ওকে সহজে আক্রমণ করবে না। ওর গায়ের ঐ লম্বা কাঁটাগুলো অক্লেশে শেয়াল-দম্পতিকে শাসনে রাখতে পারে। ঝোপের আবছা অন্ধকার থেকে কি যেন গুঁড়ি মেরে এগুচ্ছে দেখে আমি তো বন্দুক বাগিয়ে নিচ্ছিলুম। ময়না বললে, 'ওটা ক্ষুদে—বড় শেয়াল নয়।' সত্যিই শেয়াল। চাঁদের আলোতে ছুটে এল সে। সাবধানী সজারু পিঠের কাঁটা খাড়া করে অভ্যর্থনা জানায় শেয়ালকে। কয়েক দফা ঝুল কেটেও শেয়াল কোন কূল-কিনারা করতে না পেরে ডাক দিল শেয়ালীকে। যুদ্ধের সব রকম কৌশল ব্যর্থ হল দেখে নিরুপায় শেয়াল পণ্ডিত জিভ চাটে আর লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শিকারের মাংসল বপুটির দিকে। আঃ, সজারুর ভোজ! কোথায় লাগে পায়েস পিঠে? ওর সব ভাল, শুধু ঐ পিঠের কাঁটাগুলো। শেয়ালী বলে, 'চল শেয়াল, খালের কাঁকড়া ধরি চল।' ওরা সত্যিই চলে যায়।

আবার সেই দীর্ঘ নীরবতা। গাছেরা মাটির উপর লম্বা ছায়া এলিয়ে দিতে শুরু করেছে সবে, হঠাৎ বনটা যেন কেঁপে উঠল চাপা

গম্ভীর আওয়াজে—'আ-উন'। এত চাপা অথচ এমন পিলে-কাঁপানো আওয়াজ! খালের দিক থেকে একটা মাত্র সম্বর ছুটে এল ঘাসের ঝোপটার সুমুখ দিকে। ব্যস্ত পদে গোটা দুই পাক ঘুরে সে কান খাড়া করে রইল। বোধহয় প্রতিধ্বনির পরিমাপ করে ধ্বনির দূরত্ব পরীক্ষা করে নিল। রাজসিক বপুখানি। মাথার দুপাশে উদ্ধত ভঙ্গিতে উঁচিয়ে আছে একজোড়া সুন্দর শিং—লোভনীয় বটে, তবু লোভ সামলে বসে রইলুম। শিকারের মত শিকার যে এখুনি এসে পড়বে। এখন গুলি চালিয়ে সে আশায় জলাঞ্জলি দেব কেন? একজোড়া খরগোস সম্বরের পেছন থেকে ছুটে সমুখে এসে থমকে দাঁড়াল। সম্বরও কয়েক পা এগিয়ে এলো ওদের দিকে। খরগোসেরা সম্বরকে বোধহয় মহারাজের আশু আগমন সম্ভাবনার সংবাদ জানাল। তারপর দে ছুট। সম্বরও ব্যস্ত পদে ছুটে চলে গেল। সঙ্গীহীন নিঃসঙ্গ সম্বর। ওর কথাটাই ভাবছিলুম। আমি তো জানি একদিন ওর দল ছিল, বাদশাহী জৌলুষ ছিল, কম-সে কম এক ডজন বেগম বাঁদী ছিল। বেগমদের কারো প্রতি কেউ নেক-নজর দিলে ওর লম্বা শিং দিয়ে তাকে শায়েস্তা করত। তারপর কোন একদিন তারুণ্যের কাছে হার মানতে হল তাকে। কোন এক অবাধ্য ছোকরা তার বেগম বাঁদী সব কিছুরই মালিক হয়ে বসল। সেই থেকে সে দল ছাড়া।

'আ-হুম'—শব্দটা খুবই কাছাকাছি। ঘোঁৎঘোঁৎ করে গাছের তল দিয়ে বেরুল কটি বন্য শূকর। গাছ বেয়ে সর্-সর্ করে নামলো গুটি কয়েক কাঠবিড়ালী! 'ও ভাই শূয়োর, ওদিক পানে যাচ্ছ যে বড়? শব্দ শোননি? রাজা মশায় চৌহদ্দীতে বেরিয়েছেন। এই পথেই আসছেন যে!'

'আসুকগে তোর রাজা মশায়!'

ধেড়ে শূকর ঘোঁৎঘোঁৎ করে তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে আবার তার চলা শুরু করে।

যাঃ, সব মাটি হয় বুঝি! ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। নিরুদ্ধ নিশ্বাসে প্রহর গুণছি। না, নিঝঝুম সব। বন্দুকটা নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিলুম, ময়না হাত চেপে ধরে। ঝোপের ধারে একটা অস্পষ্ট ছায়া—শুধুই ছায়া। না, চাঁদের আলোতে এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওর কায়া-বিশাল আকৃতি, উজ্জ্বল বর্ণ সমাবেশ, দশস্কন্ধ বিশাল মস্তক। হলদে চোখে সোনার রং-এর জ্বলন্ত দ্যুতি। রাজকীয় ভঙ্গি, রাজসিক চলন। গম্ভীরভাবে বার দুই পায়চারী করল। ধারালো জিভটা দিয়ে সুমুখের থাবা দুটি চেটে নিল। পায়ের নলী লাগিয়ে গোঁফেও তা দিল বোধহয়। তুলকিচালে আরও কয়েক পা এগিয়ে আসতেই আর একটি জানোয়ার ওর ঘাড়ের কাছে যেন কামড় বসাল। গর-র্-র্। বাঘ মহারাজ বিরক্তি জানায়—ওরা বুঝি একে অপরকে কামড় বসাল। গ-র্-র্—বাঘ মহারাজের গর্জনে এতক্ষণ বন কেঁপে উঠত। ওরা স্থির হয়ে আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে এতক্ষণে বুঝলুম যে ওরা একজোড়া। একটি নয়। কি দেখছে ওরা? কি আছে আমাদের গাছের তলে এমন করে দেখবার? ওরা হঠাৎ পেছু হঠে অদৃশ্য হয়ে গেল যে! ময়না হাসে।

তোমার সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরোর আগুনে শুকনো পাতা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সে ওদের চোখ এড়ায়নি। চলেই যখন যাচ্ছে তখন গুলি চালিয়ে দেখলেনা কেন? বন্দুকের পাল্লার ভেতরই পড়তো বোধ হয়।

হয়তো পড়তো। কিন্তু ওদের দেখতে এত ভাল লাগছিল যে—কথাটা ভুলেই গিয়েছিলুম। কি জানি কেন এমন ভুল।

তিন

সুন্দরবনের বনভূমি জুড়ে যেমন আছে প্রচুর রূপ আর রং-এর মোহময় পরিবেশ, তেমনি আছে প্রচুরতর প্রাণনাশের প্রয়াস। অজস্র হিংস্রতা আর হানাহানির দাপটে বনের প্রাণ-প্রাচুর্য এক এক সময় স্তিমিত হয়ে আসে। বন্য প্রাণের স্পন্দন শুধু বুঝতে পারেন তাঁরাই, যাঁরা বছরের পর বছর বনের নাড়ী টিপে বসে থাকেন মুমূর্ষু রোগীর পাশে মমতাময়ী ধাত্রীর মত। বনকে যাঁরা পেয়েছেন বন্ধুর মত নিবিড় সাহচর্যে, উপলব্ধি করেছেন তার অন্তরাত্মার সাথে একাত্মতা, তাঁরাই শুধু দেখতে পেয়েছেন তার মহিমময় বন্যসুন্দর রূপ। বনের বিশালরাজ্যে আমাদের বাসভূমির মতই একটা সমাজ-শৃঙ্খলা বর্তমান। আপাতদৃষ্টিতে যতখানি অনিয়ম তার চাইতে অনেক বড় অলিখিত এক নিয়মে বনের জীবনতন্ত্রী বাঁধা। যতখানি হানাহানি তার বন্যতায় বিদ্যমান তার চাইতে অনেক বেশি প্রীতি-প্রেমও সেখানে বিরাজমান। একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনের যোগসূত্র তার জীবজগতের কার্যধারা নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। সেই যোগসূত্রকে অনুভব করা যায় মমতাময় হাতের স্পর্শে, শিকারীর রুক্ষ চাহনিতে হারিয়ে যায় ওদের জীবনযাত্রার ছন্দ।

জন্তু-জানোয়ারের বিচিত্র জীবনধারায় বনের বানরই বোধ হয় মানব-সমাজের সব চাইতে কাছাকাছি। স্বর্গের নারদমুনির ভূমিকাটি বনভূমিতে এরাই চমৎকার ভাবে অভিনয় করে চলে। বানরই বনের স্বভাব-গোয়েন্দা। তাই এদের সামাজিকতার উপর গোয়েন্দাগিরি করা মানুষের পক্ষে মোটেই সহজ কাজ নয়। রাজস্থানের পাহাড়ী জঙ্গলে যাদের আড্ডা, তারা আকারে বড়,

কিন্তু বুদ্ধিতে দড় নয়। তারা বুদ্ধির চাইতে নির্ভর করে শক্তির উপর বেশি। স্বভাবে যেমন হিংস্র, ব্যূহ রচনায় আর যুদ্ধকৌশলে তেমনি দুর্জয়।

বানরের নিজের রাজ্য যদি কোথাও থাকে তো সে সুন্দরবন। উঁচু গাছের ডালে চড়ে এরা লক্ষ্য রাখে বনের প্রান্ত অবধি। বন্দুক-ওয়ালা মানুষ বনে ঢুকলো তো এরা দল বেঁধে তেড়ে আসবে। ভেঙচি কেটে, গাছের ডাল নাড়িয়ে, হুপ-হাপ শব্দে অকারণ লম্ফঝম্ফ দিয়ে মানুষকে ভয় দেখাবে। মানুষকে যদি বিপথে পরিচালিত করতে পারলে তো ভাল, নইলে সবাই মিলে সমস্বরে কোরাস গাইতে শুরু করবে—কি-ই-ই-ই। বানরদের এই কোরাস শুনলেই হরিণেরা পালিয়ে যাবে চোখের পলকপাতে। বাঘের আবির্ভাব নিশ্চিত হলেই বানরেরা গাছের ডালে গলাগলি হয়ে বসে গম্ভীর ঐক্যতান শুরু করে হুপ্-হাপ্-হুপ্। হরিণের দল যদি বনের পূব দিকে ছুটে পালায় তবে বানরেরা হয় উত্তর নয় দক্ষিণ দিকের গাছগুলিতে জড় হয়ে অবিশ্রাম ডাল নাড়তে থাকবে। প্রায়ই দেখেছি, বাঘ তার গতিপথ বদলে বানরেরা যেদিক থেকে গাছ নাড়া দিচ্ছিল সেই দিকেই চলে যায়। বোধ হয় বাঘ ভাবে, ঐ পথেই হরিণের দল গেছে বলেই হরিণ-বন্ধুরা পথটি পাহারা দিচ্ছে। এমনি করে বাঘকে ভুল পথে পাঠিয়ে ওরা খুব একচোট ঠোঁট উলটে হেসে নেয়। তারপর হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে গাছের ডালে দোল খাবে কয়েক বার, ক্লান্ত হয়ে শেষে গাছের ডালে বসবে আর হাততালি দিয়ে পরস্পরের মুখ চেয়ে শুধু বলতে থাকবে 'কিচির-মিচির'।

সবলের কবল থেকে দুর্বলকে রক্ষা করতে এরা যতখানি দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত সবলের লড়াই বাধিয়ে দিয়ে মজা লুঠতে এরা তার চাইতে কিছু কম ব্যস্ত নয়। কোথাও বাঘ শুয়ে একটু বিশ্রাম করছে, কিংবা ভূরিভোজনের পরে নিশ্চিন্ত মনে দিবানিদ্রার আমেজটুকু ভোগ করছে,

বানরের মাথায় অমনি তুষ্টু বুদ্ধি গজালো। বার কয়েক গা-মাথা চুলকিয়ে সে তার ফন্দীটা ঠিক করে নিলে। তারপর গাছের মাথায় চড়ে দেখে নিলে শূকরের অবস্থিতি। গাছ থেকে নেমে কিংবা ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে সে চললো শূকরের কাছে।

বন্য শূকর ঠিক বদমেজাজী নয়। তবে চটিয়ে দিলে সে ভয়ংকর হয়ে ওঠে। আর কাঠগোঁয়ার তো! শূকরের সুমুখে গিয়ে বানর এমনি ভঙ্গি দেখাবে যেন সে শূকরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছে। শূকর দু'-একবার অগ্রাহ্য করে বটে, কিন্তু বানরের ভেংচি কাটা আর লম্ফঝম্ফ দিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান তার বেশিক্ষণ সয় না। যেই চটে গিয়ে শূকর তেড়ে আসে অমনি বানর পালায় ভোঁ দৌড় দিয়ে। বেকায়দা হলেই লাফিয়ে উঠে পড়বে একটা গাছে। আবার তার সুমুখে নেমে যুদ্ধং দেহি ভঙ্গিমা, আবার শূকর বানরকে আসে তেড়ে। এমনি করে শূকরকে সে ভুলিয়ে আনবে বাঘের আস্তানায়। বাঘ আর শূকর—দুই জাতিশত্রুর কোনমতে একবার চোখোচোখি হলেই হলো। বনভূমি কেঁপে ওঠে থরথরিয়ে। শূকরের ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আর বাঘের গর্জনে গাছের পাখিরা কলরব করতে থাকে। কিন্তু শাখায় নিশ্চিন্ত ঔদাস্যে বানর দল তখন হাততালি দেয় আর মাথা নেড়ে বীরত্বের তারিফ করে, কিংবা লম্ফঝম্ফ দিয়ে মুখে খ্যাক্-খ্যাক্ শব্দ করে উভয়পক্ষকে উৎসাহিত করে যুদ্ধে।

শুধু মজার খাতিরে নয়, মানুষের প্রাণরক্ষার জন্যে মানববংশের পূর্বপুরুষ বলে কথিত এই জীবটি কৌশলে এবং আপন বুদ্ধিচাতুর্যে এমনি একটা লড়াইয়ের সূত্রপাত করেছিল বলেই আজ আমি এই ঘটনাটি শোনাতে পারলুম।

সেদিন ছিল ৪ঠা চৈত্র ১৩৪৮ সাল—আখেরি চাহার সুম্বার পরব ছিল মুসলমানদের। সারাটা সকাল থেকে দুপুর অবধি ঘুরছি 'গ্যাঁড়াপোল' পাখি শিকারের চেষ্টায়। শেষ পর্যন্ত শিকারের আশায় হাল ছেড়ে দিয়ে ক্লান্ত দেহ নিয়ে বসে পড়লুম একটা বেশ

পরিষ্কার জায়গা দেখে। মধ্যাহ্ন-ভোজনপর্ব সমাধা করে বনকর সাহেব ময়না আর তার এক সাকরেদকে নিয়ে নিকটে এক 'কূপের' কাজ তদারক করতে চললেন। কালী কপালী নিকটে কোথাও মৌচাকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে তার সন্ধানে বেরিয়ে প্রড়লো। লঞ্চের মাঝি সৌকতকে নিয়ে রয়ে গেলুম শুধু আমি। সৌকত একটু ভীতু মানুষ, বার বার গাছে চড়ে বসবার জন্যে মিনতি করে। জায়গাটা বেশ পরিষ্কার। বনের কিছুটা দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। সুতরাং সাহস দিয়ে সৌকত আলিকে বললুম, এমন জায়গায় বাঘ আসে না মিঞা আর আসলেও সে ফিরে যাবে না। তখন কে জানতো বিধাতার কত বড় পরিহাস আমি আহ্বান করলুম আমার অহংকারে। বনঘুঘু আমি, তারপর অফিসের সবাই জানে, তাদের সাহেবের মত অসমসাহসী শিকারী নেই ভূভারতে। আর আমি কিনা বাঘের…। পাশের মাটিতে শোয়ানো গাছের গুঁড়িটার উপর সটান শুয়ে পড়ে মুখে নিশ্চিন্ত তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে তুলে সৌকতকে বোঝাতে চেষ্টা করলুম বাঘকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। মিনিট কয়েক মোটে শুয়েছি, চোখের পাতা জুড়ে এসেছে ঘুমে, সৌকত ভয়জড়িত কণ্ঠে বলে—সাহেব, দুটো বানর আমাদের দিকে কি রকম করছে। একবার চোখ টেনে চেয়ে দেখলুম। সত্যিই তো, দুটো বানর গাছের ডালটা ধরে এক জায়গাতে দাঁড়িয়ে অনবরত লাফাচ্ছে। আমি উঠে বসতেই ওরা মাটিতে নেমে অমনি লাফাতে শুরু করলে। অথচ মুখে রা-বাক্য নেই। ভারী অদ্ভুত লাগলো। ভাল করে একবার চারিদিকটা দেখে নিলুম। না, কোথাও কিছু নেই ; উপরে নিচে ডাইনে বামে সবই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কোথাও কিছু নেই।

আবার শুয়ে পড়লুম। সৌকত তো পাহারায় আছেই। ঘুম এসেছিল। বেশ গাঢ় ঘুম। আচমকা ধাক্কার এক চোটে ঘুম ছুটে গেল, এক নিমিষে, সৌকত আলি আমাকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে

কাঁপছে—'বা—আ—আ—আ'। ভয়ে তার শরীরটা একেবারে কাঠ হয়ে গেছে, দেহে এসেছে আসুরিক বল। ভাল করে কিছু বুঝবার আগেই গম্ভীর চাপা আওয়াজ এলো—'হা-আ-আ-আ'। বাঘের হাই তোলার শব্দে পায়ের নিচের মাটি উঠলো কেঁপে। আমি তখন ভয়ার্ত সৌকতের বাহুবেষ্টনের বেড়াজালে এক প্রকার বন্দী। বিদ্যুৎগতিতে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে বজ্রের ঘা বসিয়ে দিলুম সৌকতের মুখে। সৌকত আলি টলে পড়লো মাটিতে। মাটিতে পড়ে আছে প্রায় সমান্তরাল ভাবে চার পাঁচটি গাছের গুঁড়ি হাত তিরিশেক জায়গা জুড়ে। মাটি থেকে গুঁড়িগুলোর অবস্থিতি একই রকমের নয় বলে উচ্চতার তারতম্যে সৃষ্টি হয়েছে এক একটা ফাঁক। সেই ফাঁকের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে বলিষ্ঠ চারখানি ডোরাকাটা পা। একবার তার লম্বা গোঁফজোড়াও দেখতে পেলুম। বাতাসের গতি প্রতিকূল থাকায় আমরা বাঘের গায়ের গন্ধ পাচ্ছি না। নইলে অনুকূল বাতাসে এক মাইল দূর থেকেও নাকে আসে ওর গায়ের উৎকট ঝাঁঝালো গন্ধ। গুলি করবার সুযোগ নেই দেখে খুব সন্তর্পণে পিছু হটে গুঁড়ি মেরে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ কোন আশ্রয়ের আশায় হাতকয়েক মোটে এগিয়েছি, শুকনো পাতার মড়-মড় শব্দে সচকিত হয়ে উঠলো বাঘটা। এক লাফে সুমুখের গুঁড়িটা ডিঙ্গিয়ে এসে কান খাড়া করে দাঁড়াল। আমিও বুকে হাঁটা বন্ধ রেখে চুপটি করে পড়ে রইলুম।

কোথাও কোন শব্দ নেই। তবুও যেন বাঘের সন্দেহ হয়। মাটি শুঁকে সে মানুষের নিশানা করতে চায়। টুক্ করে দ্বিতীয় গুঁড়িটা লাফিয়ে এবার সে এসে পড়লো আমারই গুঁড়িটার ওপাশে। গাছের আড়ালে মাটি শুঁকে শুঁকে সে কয়েক বার চলাফেরা করল ব্যস্ত পদে। আমার অবস্থা তখন নিতান্ত নিরুপায়ের মত। বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আমি তার মাথাটাকে কিছুতেই পাচ্ছি না। অথচ আমার সাথে ওর দূরত্ব বোধ হয় কয়েক গজের বেশি নয়।

সম্ভবত বাঘটা আমার অবস্থিতির কথা জানতে পেরেছিল, তাই তার ক্রোধ প্রকাশ করল হিংস্র গর্জনে। সৌকত হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে গাছের আড়াল থেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'আ-ল্-লা'। বাঘটা সৌকতকে দেখেও কিন্তু তাকে আক্রমণ করল না। শুধু মুখ তুলে আর একবার গর্জন করল। মাচায় বসে, গাছের গায়ে ছাগল বা গোরু বেঁধে রেখে বাঘকে প্রলুব্ধ করে শিকারীরা। সম্ভবত সেই কথা মনে করে বাঘটা সৌকতকে ছেড়ে মনোযোগ দিলে আমার দিকে। গুঁড়ির দুপাশ থেকে চললো দুজনের লুকোচুরি খেলা। কেউ তার আশ্রয় থেকে বার হয় না।

এমনি করে যতই সময় কাটতে থাকে ততই বাঘের রাগ বেড়ে উঠতে থাকে, ক্রুদ্ধ হুঙ্কার তত ঘন ঘন ছাড়তে থাকে। আমিও পিছু হটতে হটতে এমন এক স্থানে এসে পড়েছি যে, সোজা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওর সাথে ফয়সালা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বাঘটাও শেষ পর্যন্ত এই লুকোচুরি খেলায় বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লো সোজা শক্তির পরীক্ষায়। এইবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়লুম আমরা—জীবন-মৃত্যুর চরম মুহূর্ত। বাঘটা কিন্তু তেড়ে এলো না বা লাফিয়ে পড়বার লক্ষণ প্রকাশ করল না। গাছের ডালগুলোর আড়ালে দাঁড়িয়ে মুহুর্মুহু গর্জনে বনভূমিকে কম্পিত করে তুললো। ১২ বোরের ৩০ ইঞ্চি ব্যারেল ও ৩ ইঞ্চি চেম্বারের ইজেক্টর 'এমপায়ার'-টা আমি স্থির লক্ষ্যে রেখে এক-পা এক-পা করে পিছনের বড় গাছটার দিকে চলেছি। বাঘের স্বভাবজাত শিকার-বুদ্ধিতে আমার চালাকি ধরা পড়ে গেল—শত্রুকে নিরাপদ আশ্রয়ের সুযোগ দেওয়ার অর্থ যে কি, সে তা বেশ জানে। তাই দ্রুত কয়েক পা এমন ভঙ্গিতে তেড়ে এলো যে আমি ঘোড়াকল টিপে বসি আর কি! থমকে দাঁড়াতে হলো। আবার সুযোগ বুঝে আমি একপা পিছনে চলি তো বাঘটা দুপা এগিয়ে আসে। আমাদের ব্যবধান ক্রমেই নিকটতর হচ্ছে দেখে একবার ভাবলুম গুলি চালাই। কিন্তু আবার মনে হলো

তাতে বিপদ আরো বেশি। পেছনের গাছটা আর ছুপা হটলেই বোধ হয় পাওয়া যায়। কিন্তু শত্রু এখন স্থিরদৃষ্টি রেখেছে আমার চোখের উপর। অকস্মাৎ বানরের কলরব আর পিছনের হুড়মুড় শব্দে হাতের বন্দুকটাও বুঝি কেঁপে উঠলো। মরিয়া হয়ে আমি গাছের গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালুম পেছন থেকে অতর্কিত আক্রমণের অবকাশ রোধ করে। বিদ্যুৎবেগে আমার গা ঘেঁষে ছুটে গেল এক বন্য শূকর। চোখের পলকে বাঘ লাফিয়ে পড়লো শূকরের ঘাড়ে আর শূকরের থুঁতনীর আঘাতে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

এবার বাঘ আর লাফ দিলে না। মাটিতে শুয়ে পড়লো শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার ভঙ্গিতে। শূকর তীরবেগে তার চোয়াল উঁচিয়ে আক্রমণ করল বাঘকে। বাঘ ক্ষিপ্রতার সাথে লাফ দিয়ে শূকরের আক্রমণ ব্যর্থ করল। তারপর পেছন থেকে লাফিয়ে পড়লো বিপক্ষের উপর আর কামড় বসাল শত্রুর ঘাড়ে। শূকর মুখটা মাটিতে ঢুকিয়ে ডিগবাজী দিয়ে গড়িয়ে পড়তেই বাঘও ছিটকে পড়ল মাটিতে। এবার সে তার ধারালো দাঁত দিয়ে আঘাত করলো বাঘের পেটে। বাঘ ধরলে ওর ঘাড় কামড়ে। শূকর তার ধারালো দাঁতে লাঙ্গলের ফলার মত মাটি চষে বাঘকে ঠেলে নিয়ে এলো আমার দিকে। লাফ দিয়ে সরে পড়লুম তাই রক্ষে। নইলে বাঘটাকে ঠেলে এনে আমার ঘাড়েই ফেলতো ঠিক। গাছের গায়ে শূকর বাঘকে এমনি ঠেসে ধরলে যে, বাঘ শত্রুর ঘাড়ের কামড় ছেড়ে আত্মরক্ষার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। ভীষণ হুঙ্কার করে বাঘ তার প্রচণ্ড থাবার আঘাতে শূকরকে পিছু হটতে বাধ্য করলো।

আবার লাগলো লড়াই। এতক্ষণ এমন ক্ষিপ্র গতিতে লড়াই চলছিল যে আমি অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম। আত্মরক্ষার যেন তাগিদ ছিল না মনে। এইবার গাছে চড়ে নিজেকে নিরাপদ ব্যাবধানে সরিয়ে নিতে হবে। কে জানে এই যুদ্ধের ফলাফল কি। কি সর্বনাশ! সৌকত আলি অচৈতন্য হয়ে মাটিতে পড়ে আছে।

আর বানর দল তাকে টানাটানি করে তার গায়ের ফতুয়া, লুঙি ছিঁড়ে টুকরো ট্যানা বানিয়েছে। সৌকতকে ওরা ছোট ছোট গাছের ডাল চাপা দিয়ে বোধ হয় বাঘের দৃষ্টি থেকে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করছে। তখনও দেখলুম কেউ কেউ ওকে গাছের ভাঙা ডালের পাতার আবরণে ঢেকে রাখতে ব্যস্ত। সৌকতকে পাহারা দিতে গিয়ে আমার আর গাছে চড়া হল না। অবিশ্যি আসল বিপদ আমার কেটে গেছে। আবার যুদ্ধ দেখতে লাগলুম। শেষ পর্যন্ত বন্য শূকরকে ধরাশায়ী করে ব্যাঘ্ররাজ জয়ের হুঙ্কার ছাড়লো। আহত রক্তাক্ত দেহের ক্ষতস্থান চেটে বাঘটা আঘাতের ধাক্কা সামলে নিচ্ছে সবে, কোথা থেকে ছুটে এসে ওর সুমুখে পড়ে গেল কালী। বাঘ আর ফুরসৎ পেলো না বিশ্রামের। পেছনের দু' পায়ে ভর দিয়ে কালীর কাঁধের উপর বসালো দুই থাবা। বাঘ আর কালী জড়াজড়ি করে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। নিমেষের মধ্যে কালী বাঘের উপর চেপে বসলো। এক ঝাঁকুনিতে বাঘ কালীকে ছিটকে ফেলে দিলো তার বুকের উপর থেকে।

মুহূর্তের অবকাশ না দিয়ে বাঘ সুমুখের পা দুটো তুলে দ্বিগুণতর শক্তিবেগে থাবা মারে বুঝি কালী কপালীর লোহার মত শক্ত চওড়া বুকে। কালীর গতিবেগও অসাধারণ ক্ষিপ্র। মাটিতে পড়েই সে আবার বিদ্যুৎগতিতে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। জানোয়ারটা তার থাবা দুটো ওর বুকে বসাবার আগেই কালী তার হাতের টাঙ্গিটা ঘুরিয়ে বাঘের মাথা লক্ষ্য করে হানলো প্রচণ্ড আঘাত। লক্ষ্য ফসকে টাঙ্গির ঘা পড়লো বাঘের ঘাড়ের উপর। ভীষণ গর্জন করে বাঘটা মুখ থুবড়ে পড়লো মাটিতে। চোখের পলক ফেলতেই যেটুকু দেরি। আবার সে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলো প্রতিপক্ষের ঘাড়ে। কিন্তু সে আর হলো না। আমার বন্দুকও ওরই গর্জনের সাথে গর্জে উঠলো সমান ওজনের ভারী আর ভয়ংকর শব্দে। জোড়া গুলি একসঙ্গে গিয়ে বিঁধলো ওর মাথায়। দু-একবার এদিক-ওদিক

ছুলে ওর মাথাটা আপনা থেকেই ঝুলে পড়লো মাটিতে। বাঘটা হাত-পা বিছিয়ে লুটিয়ে পড়লো মাটির শয্যায়। আর উঠবেনা সে।

বাঘের সেই বিশাল স্পন্দনহীন দেহটাকে নেড়েচেড়ে কালী আমার মুখের দিকে চেয়ে বলে, দেখছো রাজাভাই! ব্যাটা সত্যিই জাতরাজা। কি গর্বিত ভঙ্গিটা দেখছো। শূকর তার ধারালো দাঁত দিয়ে পেটটাকে ফেড়ে দিয়েছে একেবারে, টাঙ্গির ঘায়ে মাথাটা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ঘাড় থেকে। তবু কি অমিত বল আর কি দুরন্ত গর্জন!

এইবার সমস্ত ঘটনাটা বোঝা গেল পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা আর বিচ্ছিন্ন কার্যকারণগুলিকে একই যোগসূত্রে গেঁথে। যে গুঁড়িটার উপর আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, সেই গুঁড়িটা থেকে তৃতীয় গুঁড়িটার তলায় মস্ত একটা খাদ। সেই খাদে শুয়ে গভীর নিদ্রামগ্ন ছিল বাঘটি আমাদের কিছু আগে থেকেই। খাদের ভেতর কিছু টাটকা মাংস থেকে তখনও জমাট রক্তের দাগ মোছে নি। প্রচুর হাড়গোড় ছড়িয়ে রয়েছে খাদের মধ্যে। ভূরিভোজনের পর বাঘের নিদ্রাটা হয়ে পড়েছিল অনেকটা কুম্ভকর্ণের মত। তবে ভূরিভোজনের পর মানুষের মতই ওদের জলপিপাসা বেড়ে ওঠে। তাই বড়জোর ঘণ্টা দেড়েক একটানা ঘুমিয়ে আবার জল খেতে যায়। পেট ভরে জল খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। আজও ঠিক তাই ঘটেছে। বানর দুটো আমাদের বোঝাতে চেয়েছিল বাঘ ঘুমোচ্ছে আমার পাশ শুয়ে। পাছে চেঁচামেচিতে বাঘের ঘুম ভেঙে যায় সেইজন্যেই ওরা নিঃশব্দে অবিশ্রান্ত লাফিয়ে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করেছে। আমি ঘুমিয়ে পড়লে সৌকত দেখেছে, পুরুষ বানরটা গাছের মাথায় উঠে কি যেন দূরের জিনিস সন্ধান করলো। তারপরে ছুটে চলে গেল দৃষ্টির বাইরে। আমাদের প্রাণরক্ষার জন্যেই সে শূকরকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে এখানে। সে তো জানে, বাঘটা এখুনি ঘুম ভেঙে উঠবে আর আক্রমণ করবে আমাদের।

যখন ওদের কাছে বিদায় নিলুম তখন বানর-দম্পতি গলা জড়াজড়ি করে বসে কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। হাত নেড়ে বিদায় জানাতেই ওরা ঠোঁট উলটে হাসলো আর হাততালি দিয়ে প্রত্যুত্তর দিলো। বোধ হয় বললে, 'বাহাদুর মানুষ ভাই! সাবাস! কিন্তু ভুলে যেয়ো না আজ আমরা ছিলুম তাই রক্ষে। অকৃতজ্ঞের মত আর যেন বন্দুক উচিয়ে ধরো না আমাদের বুক লক্ষ্য করে।'

সরকারী নথিপত্রে লেখা হলো ঘটনাটি একেবারে নিরস ৪৬টি শব্দের সংখ্যাতাত্ত্বিক সমাবেশে। তারিখ দেওয়া হলো ৮ই মার্চ, ১৯৪২ সন। মনে পড়লো মা বলতেন, 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে'।

চার

এইতো সেদিন হিল্লী-দিল্লী-কাশী-কাঞ্চী-বম্বে-ট্রম্বে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছিলুম। সিমলা থেকে সিংহল কিংবা সোদিয়া থেকে সুরাট অবধি চৌহদ্দী করে প্রবাসী বাঙালীদের আড্ডাগুলো পরিক্রমা করে বেড়ানোটা যেন নেশার মতই আমাকে পেয়ে বসেছে। পুরানো দিল্লীর এক বনেদী আড্ডায় যেয়ে হাজির হলুম সেদিন সন্ধ্যেবেলায়। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দাশগুপ্ত আমার লেখার কথা তুললো। 'শিকার কাহিনী লিখলি কই? শুধু সুন্দরবনের কথা লিখেই লেখা বন্ধ করে দিলি?'

হাসি পেল, তবু উত্তর দিলুম, 'আরে ভাই, আমি কি ইচ্ছে করে বন্ধ করলুম। পত্রিকাওয়ালারা বলছেন, বাঘ শিকারের ফটো দাও—একটু থ্রিলিং গোছের। এই মনে কর বাঘটা তোর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছে, তখন বন্দুক কাঁধে ঝুলিয়ে রেখে ক্যামেরার একটা শট নে। তবেই তো বোঝা যাবে, হ্যাঁ, তুই একটা শিকারী।'

হো-হো করে হেসে উঠল সবাই, কিন্তু সরকারের মুখে হাসি ফোটেনি, বরং মাথায় খুন চেপে গেল বোধ হয়।

তোর ঐ সব বোঝাবুঝি রেখে দে এখন। দিলেই তো পারিস ছু-চারটে ফটো—বললে সরকার। চটপট জবাব দিতে সরকারের জুড়ি নেই ভূভারতে। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের চোস্ত কর্মচারী—একটু স্মার্ট তো হবেই। আমাকে জবাব দিতে হল না। এগিয়ে এলেন আয়েংগার।

'বাংলা দেশের মানুষ বটে তুমি সরকার, কিন্তু দেখেছ সুন্দরবনটা? খুলনা জেলার গা ঘেঁষে যার শুরু আর শেষ যার বে-অব-বেঙ্গলের বেলাভূমিতে, অন্তত সেই অংশটুকু দেখেছ কখনও? দেখনি—কেমন তো? আমি দেখেছি, ঐ চেঠিয়া দেখেছে। বনের ভেতরটাতে ঢুকতে পারিনি বটে, কিন্তু বনের কাদায় পা দিয়েছি।'

কথা বলার সুযোগ এসেছে দেখে চেঠিয়া আড়ামোড়া ভেঙে নিল। আয়েংগারের কথার পিঠে চেঠিয়া আরও ছুটো কথা জুড়ে দেয়—

'ওটা সুন্দরবন নেই আছে, ওটা একদম কাদা সমুন্দর আছে। বড় ভারী জংগল আছে, এক রাত আমি নিদ্ যাইনি।'

সত্যিই সুন্দরবনে বেড়াতে গিয়ে বেচারী একরাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছিল। খুলে বলি তবে চেঠিয়া বেচারীর স্মরণীয় সেই রাতের কথাটা।

১৩৪৬ সাল সেটা। তারিখ ঠিক মনে নেই। আয়েংগার আর চেঠিয়া এক বাঙালী বন্ধুর সঙ্গে আতিথ্য গ্রহণ করল আমাদের বাড়িতে। তিন বন্ধুতে মিলে কিছুকাল ধরে নাকি বঙ্গদেশের প্রাচীন কীর্তি-চিহ্নগুলি দর্শন করে বেড়াচ্ছিল। দক্ষিণ ভারতের মানুষ দক্ষিণ বাংলার ধুমঘাটে এসেছে। উদ্দেশ্য, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের আমলের কীর্তি-চিহ্নগুলি দর্শন করে ঐতিহাসিক জ্ঞানভাণ্ডারের

পরিধি বৃদ্ধি আর বাহান্ন পীঠের এক পীঠ যশোরেশ্বরী দেবীর মন্দির পরিক্রমার দ্বারা পুণ্য-সঞ্চয়ন। আমরা সুন্দরবনে যাচ্ছি শুনে ওরাও সঙ্গ নিলে।

সুন্দরবনের রায়াবাদা এলাকা। ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের একেবারে খাস তালুক বলেই রায়বাদা নামে এর পরিচয়। বন যেখানে ত্রিভুজের আকার নিয়ে মালঞ্চ নদীর কোলে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে সেখানটাতেই আমাদের লঞ্চ নোঙর করল। বনদেবীর সোনালী মুকুটে প্রভাতসূর্য তখন ছড়িয়ে দিয়েছে আবীর-রাঙা রঙ।

সেদিন ছিল সোমবার—জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পরদিন। শিকারী মহলে আর মাঝি মাল্লাদের ভেতর সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে আজ। ব্যাঘ্রদেবতার পূজোর আয়োজনটাও বেশ বড় রকমের হল। ওদের বিশ্বাস, দক্ষিণরায়ের পুজো সেরে বনে উঠলে বাঘ তাকে আর ছোঁবে না। পুরোদস্তুর শিকারী সেজে আমরা যাত্রা করলুম—ঠিক যেন গরিলা যুদ্ধের একটা ছোটখাট বাহিনী।

জঙ্গল ত জঙ্গল—একেবারে ঘন নিরেট বন। পায়ের গামবুট তলিয়ে যাচ্ছে কাদায়। দুহাতে জঙ্গলের গাছ পালা ঠেলে তবেই পথ করে নিতে হচ্ছে। দশটা হাত থাকলে বোধ হয় হাতের প্রহরণ মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দশ হাতেই জঙ্গল ঠেলে দেহটাকে বাঁচাতুম। এতদিন শুনে এসেছি রায়বাদা নাকি বাঘের সব চাইতে বড় আড্ডা। পায়ের ধাপ ফেলেছো কি বাঘের সঙ্গে মোলাকাত হয়ে যাবে। শুধু আবাদী অঞ্চলের লোকে বলবে কেন, বন বিভাগের কদমতলী অফিসের সরকারী নথিপত্রেও এই অঞ্চলটাকেই বাঘের সব চাইতে বড় আস্তানা বলা হয়েছে। প্রায় এক ঘণ্টা পথ চলেও কিন্তু বাঘের টিকিটাও দেখা গেল না। তবে হ্যাঁ, একটা ছোট খালের উপরে বাঘের পায়ের দাগ দেখলুম। কাদার খোঁচ থেকে মনে হল একটি দুটি নয়, কমপক্ষে গোটা তিনেক বাঘ ঘণ্টা খানেকের মধ্যে এই খালটা পেরিয়ে গেছে। খাল পার হবার উপায় খুঁজে

বেড়াচ্ছি, খালের ওপার থেকে হঠাৎ জলে লাফিয়ে পড়ল একটা সড়েল আর ওকে তাড়া করে ওর ঠিক পিছু পিছু একটা বনবেড়াল। আর যায় কোথায় ? জলের উপর দেহটাকে ভাসিয়ে তরতর করে ছুটে চলল এক মস্ত কুমির। সড়েল জলে ডুব দিতেই কুমিরও তলিয়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তার মস্ত হাঁ-এর মধ্যে সড়েলটিকে চেপে নিয়ে কুমির আবার জলে ভেসে উঠল। ক্ষুদ্র শিকার নিমেষেই অদৃশ্য হয়ে গেল শিকারীর মুখগহ্বরে। ঐটুকু আহারে কি কুমির ভায়ার অতবড় পেটটা ভরে! বনবেড়ালকে তেড়ে গিয়ে কুমির তাকে ধরে ফেলে আর কি! বনবেড়াল তখন তার নিজের প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত। কোনমতে ডাঙায় উঠে এইবার ক্ষুদে বাঘ-মশায় রুখে দাঁড়াল। চোখ পাকিয়ে কুমিরকে বেশ একটা ধমক দিলে দাঁত খিঁচিয়ে—'খ্যাক্-খ্যাক্'। কুমির বলে, 'তবে রে, দাঁড়া দেখাচ্ছি মজাটা'। কুমির তার বিশাল দেহটা নিয়ে ডাঙায় উঠতেই বনবেড়াল পালিয়ে গেল ভোঁ দৌড় দিয়ে। মুখের শিকার ফসকে গেল দেখে কুমির ভায়ার এবার নজর পড়ল আমাদের দিকে। বোধ হয় ভাল করে আমাদের দেখে নিল, এক মুহূর্ত ভেবেও নিল। তার পর গুটি গুটি পা ফেলে এগিয়ে এল কিছুটা। ভাবভঙ্গিতে ওর পাকা ধড়িবাজের চাল।

এবার পুব-দক্ষিণ বরাবর চলে বেলা একটা নাগাদ আমরা হাঁফ ছাড়বার মত একটা জায়গা পেলুম। বনের ভেতরটাতে অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমে এসেছে। আকাশকে এবার দেখতে পেলুম। সকালের সেই হালকা মেঘ নয়—দানা বেঁধে দিগন্ত ছেয়ে আছে জমাট কালো মেঘ। থমথমে প্রকৃতি—ঝড়ের আভাস পেয়ে কি এক অজানা আশঙ্কায় বন যেন একেবারে বোবা হয়ে গেছে। কোথাও একটা টুঁ-শব্দও নেই, না একটা পাখির ডাক, না একটা শেয়ালের হুক্কাহুয়া, না একটা কাঠবিড়ালীর ছুটে চলায় শুকনো পাতার সর-সর শব্দ। হুহু করে এলো দমকা বাতাসের ঝাপটা।

বাতাসের সে কি ভয়ঙ্কর গর্জন! শিবঠাকুরের তাণ্ডব নাচে যেন তাঁর লক্ষ লক্ষ ভূত-প্রেত আর চেলা-চামুণ্ডার দল মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠলো এক নিমিষে। মড়মড় করে গাছের ডালগুলো চারিপাশ থেকে ভেঙে পড়তে থাকে আমাদের সুমুখে, পেছনে, ডাইনে, বামে। বৃষ্টির ছাট নামল। মোটা মোটা ফোঁটায় তারা যেন সারা বনটা জুড়ে চাবুক চালিয়ে চলেছে এলোপাথাড়ি। কি দুরন্ত শব্দতরঙ্গ—ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির কি ভয়ানক খেলা! একটা গোটা গাছই উপড়ে পড়ল আমাদের নাকের ডগায়। ময়না শিকারী চিৎকার করছে প্রাণপণে—কিন্তু শোনে এমন সাধ্য কি কানের?

কড়কড় করে ডেকে উঠলো মেঘ। মাটির বুকটা যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল। আলোর ঝলসানিতে বোধ হয় আগুন ঠিকরে পড়ল গাছের মাথায়। আগুনের ঝলকে চোখের পাতা কেন, ভেতরটাও যেন পুড়ে গেল। দুহাতে চোখ চেপে ধরলুম। আর নয়। এবার ছুটতে শুরু করি। সুমুখের পথ দিয়ে ছুটে পালাল একদল সজারু—গায়ের লম্বা কাঁটাগুলো খাড়া হয়ে আছে। দল বেঁধে ঘোঁৎঘোঁৎ করে ছুটে চলেছে শূকর ধারালো দাঁতে লতার বেষ্টনী ভেদ করে। রকমারি জাতের হরিণ লাফিয়ে চলেছে তিড়িং তিড়িং। কুশের জঙ্গলে ঢুকে উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে রইলুম। পিঠের উপর তখন বৃষ্টির চাবুক পড়ছে সপাং সপাং। আমি, কালী কপালী আর ময়না—বনকর সাহেব, কাসেম আর মৈজুদ্দিন কোথায় ছিটকে পড়েছে কে জানে।

একঘণ্টা বাদে বৃষ্টি থেমে গেল—ঝড়ও। আকাশে উঁকি দিল দুপুর শেষের নিষ্প্রভ সূর্য। টগবগ করে লাফিয়ে কোত্থেকে এসে হাজির হল দুটি বাঘের ছানা। খেলায় তারা এমনি মশগুল যে আমাদের গ্রাহ্যই করল না। বাঃ বাঃ! কি নধর তেল-কুচকুচে দেহ! কি রূপ আর রংএর বাহার! ময়না আর কালী ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরে ফেলল শিশু দুটিকে। খেলা ভেঙে যাওয়াতে ওরা

রাগে একেবারে গরগর করে উঠল—'গর্-র্র্—গোঁ-গোঁ'। গামছা দিয়ে ওদের মুখে চাপা দিতেই ওরা নখের আঁচড়ে আর ছোট ছোট দাঁত দুটির কামড়ে নিজেদের মুক্ত করতে চেষ্টা করে প্রাণপণে। একেবারে নাবালক শিশু। পায়ের নলী শক্ত হয়নি তখনও—তাই রক্ষে। অজানা আশঙ্কায় আমার বুকটা কেঁপে ওঠে। শিশুর পশ্চাতে নিশ্চয় আছে তার মায়ের সদাজাগ্রত পাহারা। সে পাহারাকে উপেক্ষা করা যায় একমাত্র বন্দুকের জোরে। কিন্তু আমাদের হাতের হাতিয়ারগুলো তো ভিজে।

কুশের জঙ্গলের বাইরে আসতেই দেখি বাঘিনী মা আমাদের নির্গমনের পথ পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যু যেমন ব্যূহমুখে ফাঁপরে পড়েছিল, আমাদের অবস্থাও তথৈবচ। ময়নার কোলের ব্যাঘ্রশিশুটি ততক্ষণে মুখের উপরকার পর্দা ছিঁড়ে ফেলেছে। মাকে দেখেই সে সাড়া দিল, 'গোঁ-ও-ও-ঘউ'। বাঘিনী-মাও সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর দিল সন্তানের ডাকে। প্রথমটা গোঙরানি—ধীরে ধীরে সেই গোঙরানি উচ্চগ্রামে উঠতে থাকে। গা ঢাকা দিয়ে ওর চোখের আড়াল হতে পারলে অব্যর্থ সন্ধানে ওকে ঘায়েল করা সহজ হবে, নিশ্চিত হবে। তাই কুশের জঙ্গলের আড়ালে আত্মগোপনের চেষ্টা করতেই বাঘিনী ক্রুদ্ধ গর্জন করে তার আপত্তি জানায়। ময়নার অবস্থাই সবচেয়ে সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠেছে। বাম হাতে শিশুটিকে বুকে চেপে ডান হাতের বন্দুক সে স্থির লক্ষ্যে রেখেছে বাঘিনীর মাথার মাঝখান বরাবর।

ময়নার বন্দুকে মাত্র একটি গুলি ভরা আছে। আর সে বাঘিনীর সবচাইতে কাছাকাছিও বটে। এহেন অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা বেশিক্ষণ চলে না। তাই আমরা পায়ে পায়ে হটে চলেছি পেছনে। উদ্দেশ্য, আমাদের ফারাকটাকে আরও বাড়িয়ে তোলা। কিন্তু বাঘিনীও বোকা নয়। আমরা যেমন এক-পা এক-পা করে পিছু হটছি, ঠিক তেমনি এগিয়ে আসে বাঘিনী—গুটি গুটি পা ফেলে

তালে তাল মিলিয়ে। এতক্ষণে দেখলুম বাঘিনীর সাথে আরও একটি বাচ্চা। শিশুটি কিন্তু অতশত বোঝেনি। মায়ের আগেভাগেই লাফিয়ে বেড়াচ্ছে সে। শেষ পর্যন্ত বাঘিনী মারমুখী হয়ে উঠল। ঘন ঘন লেজের তাড়নায় আর ক্রুদ্ধ গোঙরানিতে সে তার আক্রমণের আভাস দিলে। ময়নাকে বললুম, কোলের শিশুটিকে মাটিতে নামিয়ে দিতে। ছাড়া পেয়ে শিশুটি ছুটে গেল ওর মায়ের কাছে। মনে হল বাঘিনী পেছনের পা ছুটিতে ভর দিয়ে দেহটাকে তলোয়ারের মত সোজা করে নিল—শত্রুর বা শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার পূর্বমুহূর্তের ভঙ্গি। চোখের পলকে ট্রিগার টেনে দিলুম। কিন্তু কালী কপালীর বিশাল বাহুর এক প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়লুম আমি ট্রিগার টানার সাথে সাথেই। বন্দুক আর বাঘিনী দুয়েই গর্জন করে উঠল একসঙ্গে। একবার ডিগবাজী খেয়েই আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালুম। আবার ভরে নিলুম বন্দুক। কি সর্বনাশ!

যমদূতের মত জোয়ান কালী কপালী মাটিতে চিৎপাত। ওর লোহার মত শক্ত চওড়া বুকের উপর বসে বাঘিনী যেন কালীর মুখে মুখ ঘষছে। বাঘিনীর গলা জড়িয়ে ধরেছে কালী তার ডান বাহুর শ্বাসরোধকারী বেষ্টনে, আর দুহাতে প্রাণপণে টেনে রেখেছে বাঘিনীর দুটি চোয়াল। বাঘিনীর মুখ থেকে অবিশ্রান্ত লালা ঝরছে কালীর গায়ে, অদ্ভুত রকমের একটা আওয়াজ বেরুচ্ছে তার গলা থেকে। ময়না ওর বন্দুক আমার হাতে দিয়ে মাটি থেকে কুড়িয়ে নিল কালী কপালীর টাঙ্গি। তারপর তার ভোঁতা দিকটা দিয়ে বাঘিনীর ঘাড়ের উপরে বসিয়ে দিল প্রচণ্ড এক ঘা। বিকট হুঙ্কার ছেড়ে প্রবল এক ঝাঁকুনী দিয়ে কালীর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল বাঘিনী। ময়না এবার টাঙ্গির ধারালো দিক দিয়ে হানলে দ্বিতীয় আঘাত। বাঘিনীও আক্রমণ প্রতিরোধ করতে টাঙ্গির উপর মারলে থাবা। থাবার আঘাতে টাঙ্গি ছিটকে বেরিয়ে গেল ময়নার হাত থেকে। এই সুযোগে আমি বন্দুক লক্ষ্য করলুম।

কিন্তু বাঘিনী বিদ্যুৎবেগে এমনি ছিটকে গেল যে আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেলুম। দ্বিতীয়বার লক্ষ্যস্থির করবার আগেই বাঘিনী তার বাচ্চা দুটোকে মুখে নিয়ে লাফ দিল। আমার বন্দুকের গুলিও ছুটলো। বাঘিনীও হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। একটা বাচ্চাও বোধ হয় পড়ে গেল মাটিতে। কিন্তু চোখের পলক ফেলতে যেটুকু দেরি। আবার লাফ দিয়ে বাঘিনী তার কোলের মানিক দুটি নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল বনের মধ্যে। বন থরথর করে কেঁপে উঠলো তার হুঙ্কারে।

শাবক-হারা মা—তারপর গুলি খাওয়া বাঘিনী। সে যে মহা ভয়ঙ্করী হয়ে বন তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে তা বেশ বোঝা গেল তার গর্জন থেকে। গুলির শব্দে আমাদের নিশানা ঠাওর করে বনকর সাহেব আর আমাদের অন্যান্য লোকজনেরা একটু বাদেই এসে হাজির হল। শব্দ শুনে গভীর বনে নিশানা ঠাওর করা খুব সহজ কাজ নয়। ওটা বনকর সাহেবের মতই বনঘুঘুদের পক্ষে সম্ভব। ফেরার পথে প্রতিক্ষণেই আমরা অনুভব করছিলুম যে সন্তানহারা বাঘিনী-মা আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি। তার গর্জন শুনতে পেলুম লঞ্চে উঠেও—বোধ হয় সেই তার শেষবারের আর্তনাদ।

পাঁচ

সে একদিন ছিল। রিম্-ঝিম্-ঝিম্ বাদল-ঝরা রাতে ঘুম ঢুলুঢুলু চোখের পাতায় ঘুমের পিসির পিঁড়ি জুড়ে এসে বসতো রূপকথার রাজপুত্তুর আর চোখজোড়ার ঝাপসা দৃষ্টি জুড়ে চলে বেড়াতো গহন বনের সেই বাসুকি বংশধর। সাত রাজার ধন মাথায় যার মণি হয়ে পাতালপুরীর আঁধার পথ আলো করে—সেই অজগর। বড় হয়ে বিদ্যেবুদ্ধির জেরার জ্বালায় মগজ থেকে ওর মাথার মণির লোভকে নির্বাসন দিলুম বটে, কিন্তু মন থেকে ওর স্বপ্নকে নাকচ

করা সহজ হল না। সে এক মনের জ্বালা! জানি ওর মাথায় মণি নেই কিংবা পাতালপুরীর রাক্ষস রাজার বাড়িতে কোন কুঁচবরণ রাজকন্যে তার কালোবরণ কেশ এলিয়ে আমার প্রতীক্ষায় বসে নেই—তবু যেন ঐ অজগরের চিন্তাটা অশরীরী ছায়ার মত নিত্য আমার পিছু নিয়েছে।

বলি বলি করে শেষ পর্যন্ত ময়নাকে বলেই ফেললুম কথাটা। ময়না বলে, সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পাড়ি দেবার মত অনেক খাল অনেক বন পেরুতে হবে কিন্তু। মানুষের তাড়া খেয়ে ওরা মানুষের যাতায়াতের চৌহদ্দী ছেড়ে নাগালের বাইরে বাসা বেঁধেছে। বুড়ো বরকন্দাজ আকবর আলি মাথা নেড়ে সায় দেয় সে কথায়। এই আকবরের মুখেই তো কতবার শুনেছি সেই গাছের গুঁড়ির গল্পটা। ঝড়ে উপড়ে পড়া মস্ত লম্বা একটা গাছের গুঁড়ি। মৌচাকের তালাস করতে মৌমাছিদের পেছু ছুটে শেষ পর্যন্ত আকবর আলি সেদিন এসে পড়লো বনের এক অচেনা রাজ্যে। সেখানে নাকি ঘুমপাড়ানী গান গায় ডাইনীরা। সুরেলা গলার মৃদু মিষ্টি সুরের রেশ বনের বদ্ধ বাতাসে গুমরে মরে, কাঁপন লাগায় পাতায় পাতায়।

একছিলিম কড়া তামাক সেজে গুঁড়িটার উপর চেপে বসে আরাম করে সেবন করলে আকবর। তারপরে কলকেটা সে উপুড় করে দিলে গুঁড়িটার উপরে। আগুনের ছোঁয়া লেগে গুঁড়িটা নড়ে উঠতেই আকবর আবিষ্কার করে ওটা স্থাবর কিছু নয়, নিতান্তই একটা স্থবির জীব—আসলে একটা আরামী অজগর। ওর রাক্ষুসে হাঁ-এর মধ্যে আকবর তার দশ হাত বুকের পাটা সমেতও স্বচ্ছন্দে সেঁধিয়ে যেতে পারত। রক্ষে যে সে ওর মুখের থেকে অনেকখানি দূরেই রয়ে গেছে বরাবর। একটা শিংওয়ালা অজগরও নাকি দেখেছে সে একবার। ময়নার সঙ্গে মিঞার তর্ক বাধতো এই নিয়ে। ময়না বলে, গোটা একটা হরিণের ছানাকে গলাধঃকরণ করেছে।

শিং সমেত গিলতে পারে না বলেই শিকারের শিং জোড়া বাইরে থাকে। মনে হবে যেন সাপের মুখের দুপাশে গজিয়ে উঠেছে হরিণের শিংজোড়া। দুতিন দিনেই পেটের ভেতরকার শিকারের দেহটি হজম হয়ে গেলে শিং জোড়াও মাটিতে খসে পড়ে। কিন্তু ওকথা এখন থাক।

মুনসীগঞ্জের কাছারি বরাবর নদী পেরিয়ে তেরকাঠির বাদার বড় খাল বেয়ে চলতে চাইছিলুম। মস্ত খালটা হঠাৎ একটা মোচড় দিয়ে চলার পথ ডাইনে ঘুরিয়ে দিলে। নায়ের মাঝি নৈমুদ্দিন বলে, তেরকাঠির বাদা পেরিয়ে তবেই রাতের বাসা বাঁধব।

রাত গেল। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখন নয়। রাত পোহাল। ছোট্ট ডিঙ্গিখানা হঠাৎ যেন দূর সমুদ্রের সাড়া পেয়ে দুলে দুলে চলেছে। দিন গড়িয়ে চলল দুপুরে। চেনা বন হঠাৎ যেন তার রূপসী রানীর খোলসটা ছেড়ে রূপকথার রাক্ষুসীর হাঁ মেলে ধরল। গাছের ছায়াগুলো বামন অবতারের মত গুঁড়ি মেরে গাছের নিচেই গুটিয়ে বসেছে। বনের কাদায় পা দিতেই বুঝি—কাঠুরে এখানে কাঠ কাটেনি কোনদিন, মৌ চোরেরা মৌচাকে সিঁদ দেয়নি, একটা পায়ের ছাপও নেই কোথাও—নেই এতটুকু নিশানা। পাতালপুরীর অন্ধকার যেন জমাট দানা বেঁধে আছে বুকের উপর। পাষাণভার হয়ে চেপে আছে রূপকথার সেই পাষাণপুরীর নীরবতা। পথ পাই না, তাই কুশের জঙ্গলের গা ঘেঁষে চলি। এতক্ষণে দেখতে পাই মাথার উপরে আকাশ আছে—বনের মতই অন্তহীন একটা বিরাট নীল চাঁদোয়া। লক্ষ মণির মালা গেঁথে জ্বলছে সূর্য। চোখ ধাঁধানো তার আলো। ঘাসের এলাকা পায়ে পায়ে পরিক্রমা করছি—অন্দর মহলের উপর নজর পড়তেই দেখি, রাক্ষুসে বন হঠাৎ যেন নববধূর বাসর সাজিয়ে বসে আছে। আদ্যিকালের বুড়ো গাছেরা মাথার জট মাটিতে লুটিয়ে দিয়েছে। ফুলওয়ালী লতারা যেন মহাদেবের মাথার জটায় ফুল গুঁজে বরের বেশে

সাজাতেই ব্যস্ত। মরশুমী বনফুলের বর্ণালী উৎসব-সজ্জা। এমন ফুলবাবুর দেশটাকে মানুষের লোভ থেকে পাহারা দিতে প্রকৃতিও রেখেছে যেন অযুত পাহারাদার। গাছে গাছে সংসার পেতে আছে বংশপরম্পরায় অগণিত অজগর। ওদের দেহের দৈর্ঘ্য বলা কঠিন। প্রস্থের উপমা গাছের একটা সেরা ডালের মতই। মিটমিটে চোখ, লিক্‌লিকে জিভ, চিক্‌চিকে গায়ের বর্ণসমাবেশ। তবে ওদের বিশেষ ক্ষুধার্ত মনে হলো না। কি জানি, এই খাদ্যসঙ্কটের দিনে কে ওদের নিত্য আহার জোগায়! ওদের নড়ন কম, চলন ভারী—কুঁড়ের বাদশা যেন! তা বলে ঐ চোখ দুটো! সাক্ষাৎ শয়তানের চাহনি যেন ওদের চোখে। সমুদ্র মন্থনের হলাহল ঐ লিক্‌লিকে জিভে।

জায়গাটা বদলে একটু বসে মধ্যাহ্ন ভোজপর্ব সেরে নিতে হবে ভেবে এগিয়ে চলেছি, দেখি একপাল সম্বর-সম্বরী ঘুরে বেড়াচ্ছে একটু দূরের এক ফাঁকা মাঠে। লোড়া শিংয়ের কয়েক জোড়া হরিণও আছে হরিণীর সঙ্গে দল বেঁধে। দুর্লভ শিকারের আশায় বুকে হেঁটে নিকটের একটা গাছে সবে মাত্র চড়ে বসেছি, উঁকি দিয়ে দেখি ওরা চকিত চঞ্চল। সর্বনাশ। ওরা নিশ্চয়ই আমাদের উপস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এ যে পলায়ন পর্বের পূর্বমুহূর্তের মহড়া মাত্র! বন্দুক বাগিয়ে প্রতীক্ষা করব ভাবছিলুম, বিষপিঁপড়ের বাহিনী চড়াও হলো কোত্থেকে। রণে ভঙ্গ দিই আর কি, হঠাৎ বন কাঁপিয়ে তুললে ছোট্ট একটি হিংস্র গর্জন। মায়ামন্ত্রে যেন মিলিয়ে গেল মৃগযূথ। সবকিছু বুঝবার আগে শুধু দেখলুম, জাঁদরেল গোছের একটা সম্বরকে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে।

প্রবল উত্তেজনায় দেহটা কেঁপে উঠল। আপনা থেকেই হাতের মুঠি শক্ত হয়ে চেপে বসল বন্দুকের গায়ে। বিদ্যুতের প্যাঁচানো পাকের মত প্রচণ্ড গতিতে সম্বর তার বিচরণভূমির এলাকাটা বৃত্তাকারে চৌহদ্দী করে নিয়ে তীরের মত ঢুকে পড়ল বনের মধ্যে।

ছুটে গেল প্রায় আমাদের গাছের তল দিয়ে। তারপর দেওয়ালের গায়ে ছুঁড়ে মারা বল যেমন ছিটকে আসে—ছুটন্ত সম্বর ঠিক তেমনি ছিটকে পড়ল গাছের গায়ে ধাক্কা খেয়ে। সুমুখের পা গুটিয়ে ধাক্কাটা সে অনেকখানি সামলে নিলেও। এতক্ষণে দেখি ওর পিঠের উপর সওয়ার হয়ে আছে বিশালদেহ এক বাঘ। এই আট-দশ মণ বোঝাটাকে পিঠের উপর থেকে ঝেড়ে ফেলতে সে মরীয়া হয়ে এতক্ষণ ছুটেছে। অবাঞ্ছিত সওয়ারটিকে নাকচ করা তবুও সম্ভব হয়নি। বাঘ বোধহয় মানুষের চাইতেও দক্ষ ঘোড়-সওয়ার। কিন্তু বাঘের বরাতে সেদিন বাদ সাধলো বিধিলিপি।

গাছের ডালে লেজ জড়িয়ে শূন্যে মাথা ঝুলিয়ে দেদোল-দোল করছিল যারা, তাদেরই একটি দৈত্যদেহী সংস্করণ হঠাৎ এক খাবল বসালে বাঘের পিঠে। ক্রুদ্ধ বনরাজ হুঙ্কার ছেড়ে দাঁত খিঁচিয়ে উঠল। আবার দোল খেয়ে আর একটা ছোবল দিতেই বাঘও কামড়ে ধরল অজগরের ঘাড়। শত্রুর ঘাড় কামড়ে ধরে শিকারের পিঠ ছেড়ে বাঘ পড়ল মাটিতে। অজগরকেও নামতে হল মাটিতে।

লাগল লড়াই—রাজায় রাজায় লড়াই। রক্তাক্ত সম্বর ছাড়া পেয়ে টলতে টলতে চলে গেল। মাতাল যেন চলেছে মদের নেশায় বুঁদ হয়ে। আমাদেরও নামতে হল মাটিতে। অনেক লড়াই আমরাও জিতেছি। বন্দুক হাতে নিয়ে এমন চোরের মত পালাতে হয়নি আর কখনও। সাবাস বিষপিঁপড়ে! সারি বেঁধে চলেছে ওরা সুতোর মত, বেহুলার বাসরের সেই সরু কালনাগিনী যেন। এখন ভয় নেই। বাঘ জীবন-মরণ লড়াইতে মেতেছে—খুনের উদগ্র নেশা। বৃত্তাকারে সাজান একসার সরু গাছের নিরাপদ বৃত্তমধ্যে আশ্রয় নিয়ে এবার ওদের লড়াই দেখি।

দেখবার মত একটা লড়াই বটে! মধ্যযুগের রোমও এমন নিষ্ঠুর অথচ এমন পৌরুষের লড়াই দেখেনি। বাঘ-সাপের লড়াই। যে সে বাঘ নয় সে, সুন্দর বনের রাজা—দুনিয়ার সেরা সে। আর

ওর প্রতিপক্ষ ঐ অজগর। পাতালপুরীর নাগলোকেও ওর জোড়া মেলা ভার। বাঘের দাঁতে জোর আছে, ওর দাঁতে বিষ আছে আর আছে মত্ত হস্তীর বল ওর লেজের প্যাঁচে। লেজের পাকে শত্রুকে বন্দী করবার জন্যে কি প্রাণপণ চেষ্টা ওর। ঐ আলসে কুঁড়ে স্থবির দেহটা যে এমন ক্ষিপ্রগতি হতে পারে, এ কথা বিশ্বাস করাও দায়। ওর মুখের মস্ত বড় হাঁ-এর মধ্যে বাঘের মাথাটা অনায়াসে সেঁধিয়ে যেতে পারে। তবু যে বাঘ লড়ছে, সে ওর বিদ্যুৎগতি আর অভিনব কৌশলের জোরেই সম্ভব হচ্ছে শুধু! এক এক সময় মনে হচ্ছে বাঘ বুঝি শত্রুর লেজের ফাঁসে জড়িয়ে পড়েছে।

কি জানি কেন মনে মনে ওরই জয় কামনা করছিলুম। কি অপূর্ব ওর যুদ্ধকৌশল, কি দুঃসহ ওর পৌরুষবোধ। ইচ্ছে করলেই তো সে পালিয়ে যেতে পারত। কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি নিতে সে নারাজ। বীরের মৃত্যু অনেক বেশি বাঞ্ছনীয়। এদিকে যুধ্যমান দুইপক্ষের তর্জন-গর্জনের বহরটিও ত আর কিছু কম নয়। গোটা বনটা জুড়ে তারই প্রতিধ্বনি যেন দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে দিলে। শিবঠাকুরের লক্ষ লক্ষ চেলা-চামুণ্ডারা যেন গোটা বন জুড়ে অট্টহাসি হাসছে হা-হা-হা, আর প্রতিধ্বনি বলছে তাণ্ডব নাচের বোল— তা-তা-থৈ-তা।

যুদ্ধকাণ্ড শেষ হতে বেশ একটু সময় লাগল। সাপের মাথাটাকে শেষ পর্যন্ত চিবিয়ে ধুলো করে ফেললে। তারপর যুদ্ধক্লান্ত বাঘ টলতে টলতে গাছের গুঁড়ি দুটোর ফাঁকটুকুতে বসে পড়ল। ক্লান্তিতে ওর রুক্ষ ধারাল জিভটা বাইরে বেরিয়ে এসেছে। মুখ থেকে লালা গড়াচ্ছে একটানা। ক্লান্তিতে ও হাঁপাচ্ছে। ওর বুকের ভেতর থেকে হাঁপানি রোগীর মত একটানা একটা সাঁইসাঁই শব্দ এখান থেকেও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। গলা থেকে এক এক সময় ঘড়ঘড় শব্দও আসছে। একবার শত্রুর নড়ন্ত

লেজের ডগাটির দিকে তাকিয়ে সে সুমুখের দুই থাবার উপর মুখ রেখে শুয়ে পড়ল। রণজয়ী বীর বিশ্রাম করছে। ওর মাথার উপরে তখন টুপটাপ করে ঝরে পড়ছে সোনালী লতার সহস্র রংবাহারী ফুল। দূর সমুদ্রের গর্জন তখন বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছে মৃদু সুরেলা সঙ্গীতের ছন্দোময় স্তুতি। বনমর্মরে বাজে বীণা।

ছয়

কি জানি কেন দুর্গম গিরি দুস্তর মরু সেই আদ্যিকাল থেকে মানুষের মনকে এমনি করে হাতছানি দিচ্ছে। আর ঐ অরণ্য আদিম—ও যেন নিঝুম রাতের এক নিত্য আলেয়া। এবার কিন্তু বনের ডাক বহে নিয়ে এলো যে, সম্পর্কে সে কলেজের বান্ধবী বটে তবে স্বভাবে বেশ কিছুটা বুনো—অন্তত দুর্মুখের দল ঐ নামেই তাকে পরিচয় দিত। এ হেন একজন হঠাৎ যদি শহর থেকে দূরে আমার গাঁয়ের বাড়িতে চড়াও হয়, তাহলে? ব্যাপারটা শুনে শেষ পর্যন্ত হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। নিতান্তই একটা আটপৌরে ঘটনা। আমার মায়ের ছোটবেলাকার সই বেড়াতে এসেছেন। সঙ্গে এসেছে তাঁর কলেজে পড়া মেয়ে শিখা। মা-মেয়ে যাবেন সুন্দরবন সন্দর্শনে। বজরা বাঁধা আছে বাড়ির ঘাটে। বাবা আমাকে নিযুক্ত করলেন ওঁদের প্রহরায়। আমাকে পাহারা দিতে আবার আধ ডজন পাকা শিকারী—কালী কপালী আর ময়না শিকারী তো থাকবেই দলে। ওদের একজন বাঘিনীর কোল থেকে বাচ্চা কেড়ে নিতে পেছপা নয়, অপরজন বাঘ মেরে ব্যবসা করে।

অন্দর ছেড়ে সদরে পা বাড়িয়েছি, অন্দর মহলের গোপন চিঠি বহে এনে হাতে গুঁজে দিলে রুকসা। রুকসাকে আপনি চেনেন না নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার বন্ধু মহলের সবাই চেনে। আমার দুজোড়া

পোষা বানর-বানরীর সব চাইতে বুদ্ধিমতী এই মেয়েটি। চাই কি এপাড়া ওপাড়ার কোন বিশেষ বান্ধবী আমার সঙ্গে হীরের আংটি বদল করতে চাইলেও রুকসার হাতে আংটি দিয়ে মনের কথাটা ওর কানে কানে বলে দিতে পারে। যাক সে কথা। চিঠিটা লিখেছে শিখা। লেখার মত অবিশ্যি আর কারো গরজ নেই অন্দরে। সুন্দরবনের গল্প শুনিয়েছি সুমিতাকে। শিখার তাই জিদ, ও নিজের চোখে দেখে গিয়ে সুমিতাকে যুদ্ধে পরাস্ত করবে।

প্রথম প্রভাতের বন—লাজনম্রা ঘোমটা পরা যেন ভিন গাঁয়ের বধূ ঘোমটার আড়ালে চকিতা চঞ্চলা হয়ে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। কাকেরা বাসা ছেড়েছে বটে, তবে বানর বংশের বিশেষ তাগিদ নেই তখনও। রয়ালবেঙ্গল পরিবারের যে সব ক্ষুধার্ত মানব প্রেমিক রাতের আঁধারে লোকালয়ে হানা দিয়েছিল, তারাও নদী পেরিয়ে আবার ফিরে এসেছে তাদের অরণ্য-আস্তানায়। বজরার গুলুইতে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম বনের ওপারে লক্ষ অগ্নিশিখার জন্মলগ্নের কম্পিত চাহনি।

সহাস্যে পাশে এসে দাঁড়ালো শিখা। শিখাকে তাকিয়ে দেখি—অগ্নিশিখাই বটে! পরনে সবুজ রঙের ব্রীচ, পায়ে বুট, মাথায় হেলমেট, বাঁ হাতে ধরা রয়েছে বন্দুকের নল—পুরোদস্তুর শিকারী সেজেছে সে। গাছের ডালে বানরকুল সজাগ হয়ে তাকিয়ে দেখে আমাদের। বাচ্চাগুলো লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে গোল বাধায় আর বয়স্কেরা হাত-পা গুটিয়ে বসে শুধু ঠোঁট ওলটায়। কি জানি, ভেঙচি কাটে, না মুখ টিপে হাসে। রাজস্থানের পাহাড়ী জঙ্গলে যারা পুরুষানুক্রমে সংসার সাজিয়ে আছে গাছের ডালে—তারা অকারে বড়, প্রকৃতিতে পৌরুষদৃপ্ত, হিংস্র; তবে বুদ্ধিতে তেমন দড় নয়। ওরা ব্যূহ রচনায় দুর্জয়, চাল-চলনে গম্ভীর, ভাব-ভঙ্গিতে রহস্যময়! সুন্দরবনের বানর ওদের স্বজাতি বটে তবে সগোত্রীয় নয়। বুদ্ধির একটা বিশেষ ছাপ আছে ওদের জীবনধারায়।

ওদের উপর গোয়েন্দাগিরি করা খোদার উপর যেন খোদকারী।

বসন্ত উঁকি দিয়েছে বনে, প্রকৃতির মনের কোঠায়, জানা-অজানা গাছের লক্ষ পাতায়। বসন্তবাহারে রংবাহারী রামধনুর আলপনা আঁকা গাছের মাথায়। সূর্য তখন দুহাত ভরে মুঠো মুঠো ছড়িয়ে চলেছে ফাগ। ঘোলা জলের অযুত ধারায় তারই বিচিত্র রাগ। একটু আগেই গাছের তলে খেলা করছিল একপাল বানর। বনের সাইরেন ওরা—বুঝলুম বিপদের বালাই নেই আপাতত। ওদের তাড়িয়ে দিয়ে মাচানে উঠে বসলুম। সুমুখে গোলের ঘন বন—ছোট্ট একটা দ্বীপের মত। অগভীর ঘোলা জলের একটা শীর্ণা ধারা তাকে অজগরের লেজের পাকে জড়িয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। মাথার ওপর পাতার বেষ্টনীতে লুকিয়ে বসে 'কুই' দিচ্ছে ময়না শিকারী অর্থাৎ বানরের অনুকরণে ডাকছে বা ঝগড়া করছে। স্বয়ং বানরেরও সাধ্যি নেই যে বোঝে 'কুই' দেবার কর্তাটি তাদের স্বজাতি নয়—হরিণ তো কোন ছার। তবু মৃগযূথ তো দূরের কথা একটি দলছাড়া হরিণেরও টিকি দেখা গেল না।

শিখার রাগ হয়। এই বুঝি সুন্দরবন! আর এমনি দম বন্ধ করেই বা কতক্ষণ বসে থাকা যায়। একঘেয়ে ঝিঁঝির ডাক, বনবেড়ালের ছুটোছুটি আর সজারুদের সঙ্গে কাঠবিড়ালীর লুকোচুরি। দুপুর গড়িয়ে যায় বুঝি। ময়নার দিকে তাকাই। ময়না শুধু মুচকি হেসে পাতার দুর্গে গা ঢাকা দেয়। 'কিচ্-কিচ্—খ্যাক্-খ্যাক্'—আবার শুরু হল কুই দেওয়া। খালের ধারের সারবন্দী কেওড়া গাছের ডালগুলো হঠাৎ প্রবল বেগে দোল খেয়ে আবার স্থির হয়। ময়না চুপ করে। কিন্তু খালের ধারে তখন শুরু হয়ে গেছে বহু কণ্ঠের বিচিত্র ধ্বনির সমারোহ। শিকারী জানে এ কিসের ইঙ্গিত। কিন্তু শিখা তো জানে না। তাই চোখের ইসারায় ওর চোখ জোড়াকে টেনে নিয়ে যেতে হয় খালের ওপারে

—যেখানে নিরেট জঙ্গল হালকা হয়ে পেছনের ঘাসের মাঠে মিশে আছে। একটি দুটি করে একটু একটু করে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ওদের—হরিণ-হরিণীর শোভাযাত্রা। বসন্ত এসেছে বনে —মৃদু মলয়ের ছোঁয়া লেগে গাছে গাছে গজিয়েছে কচি পাতা— সবুজ বা হলুদ সোনা কিশলয়। হরিণের দল মেতে উঠেছে তাই বনভোজের মহোৎসবে। শিখা যেন উৎসাহে জ্বলে ওঠে।

শোভাযাত্রা এগিয়ে আসতে থাকে—পুরোভাগ আর পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করছে হরিণী। দলপতি দলের মাঝখানে। পশু জগতে এ একটা দুঃসহ ব্যতিক্রম বটে। হরিণীদের পিঠের উপর শক্ত হয়ে চেপে বসে আছে বানরছানারা—যেন ঘোড়ার উপর ঘোড়-সওয়ার। শিখা উৎসাহের অতিশয্যে কি যেন বলতে যাচ্ছিল। মুখে হাত চাপা দিতে হলো। ওতো জানে না হরিণের কত বড় দরদী বন্ধু এই বানরকুল। একটিবার যদি ওরা আমাদের অস্তিত্ব সন্দেহ করে, তাহলে এক্ষুণি এমন সংকেত করবে যে শিকার চোখের নিমিষে উধাও হবে। হলোও তাই। হঠাৎ কি হলো কে জানে? একসঙ্গে বানরকুল কোরাস গেয়ে উঠলে—'কি-ই-ই'। হরিণী থমকে দাঁড়ালে। বার দুই ঘুরপাক খেয়েই ডাকলে, 'ব্যা-এ্যা'। তারপর আচমকা একটা ছুটোপুটি। কিছু বুঝবার আগেই শুধু চোখে দেখতে পেলুম বানরদের লাফালাফি। ব্যস, গোটা বনটা যেন আলাদিনের প্রদীপের যাদুতে তার নাড়ীর স্পন্দনটুকুও হারিয়ে ফেলেছে।

আমরা কি তবে ধরা পড়ে গেলুম নাকি! না, তেমন কিছু নয়। তাহলে হরিণ বন্ধুরা মহা সোরগোল বাধাতো এতক্ষণ। সুমুখের গাছগুলোতে এসে জড় হতো। গাছের ডাল নাড়িয়ে ভেঙচি কেটে আমাদের ভয় দেখাত। ওদের ঐ লক্ষ্মী ছেলের মত চুপটি করে থাকার অর্থ আমরা জানি। আপনা থেকেই তাই হাতের মুঠি বন্দুকের উপর চেপে বসে। কিন্তু কই! আধঘণ্টা

পেরিয়ে গেল যে। খালের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে চোখ দুটোও যেন মরীয়া হয়ে উঠেছে। অস্থির হয়ে শিখা হাই তোলে আর নড়ে বসে। বনটাও যেন নড়ে ওঠলো একই সঙ্গে। খালের ওপারে খ্যাক-খ্যাক করে ওঠে একপাল বানর। গাছের ডালগুলো প্রবলবেগে নাড়িয়ে কাউকে যেন ধমক দিচ্ছে। প্রাণপণে দেখতে চেষ্টা করি। কিন্তু বাঞ্ছিতের সন্ধান মেলে না।

খালের ওপারে হঠাৎ একটা হুটোপুটি আওয়াজ—ক্রুদ্ধ ঘোঁৎঘোঁৎ। দু পাশের লম্বা ধারাল দাঁত দিয়ে একরাশ মাটি খুঁড়ে মুখ উঁচিয়ে বিকট শব্দ করে উঠল একটা জাঁদরেল গোছের শূকর। ওদিক থেকে প্রত্যুত্তরও শুনতে পেলুম এবার-- গম্ভীর ক্রুদ্ধ গোঙরানি। শূকর এবার গাছের ডাল ছেড়ে সুমুখের গাছের তলের দিকে তার লক্ষ্য স্থির রাখে। প্রতিপক্ষের গম্ভীর গোঙরানি যত উচ্চগ্রামে উঠতে থাকে শূকরও তেমনি তার স্বর চড়াতে থাকে। মুহূর্ত মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘ কিন্তু প্রতিপক্ষের থুঁতনীর আঘাতে চিৎপাত হয়েও পড়ল তক্ষুণি। দ্বিগুণ ক্রোধে জ্বলে উঠে এইবার সে হুঙ্কার ছাড়ল। শিখাও চেঁচিয়ে উঠে দুহাতে মুখ ঢাকে। পলকপাতে বাঘ আবার ঝাঁপ দিল। যুধ্যমান দুই পক্ষই যেন মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু গোলবনের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল ওরা দুজনেই। আমাদের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে হারিয়ে গেল ওরা। শুধু দুপক্ষের তর্জন-গর্জন ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে বনের বদ্ধ বাতাস গাছে গাছে ধাক্কা খেয়ে ফিরতে থাকে।

চোখে আর দেখতে পেলুম না বলেই এর আদ্যোপান্ত বর্ণনা দিতে নারাজ। তবে মোটামুটি ব্যাপারটা নিখুঁত সত্যি করে সাজিয়ে নিতে মোটেই কষ্ট হয় না। আগেই বলেছি সে কথা, তবু আবার বলছি। ব্যাপারটা আর কিছু নয়। বানর-চরিত সম্বন্ধে যিনি ওয়াকিবহাল তিনিই জানেন, এটা পুরোদস্তুর বানরদেরই কারসাজি। স্বর্গখ্যাত নারদ মুনির সঙ্গে এদের বংশগত কোন

সম্পর্ক আছে কিনা জানিনে। তবে সবলের হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা করতে এরা যতখানি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই লাগিয়ে মজা লুটতে এরা তার চাইতে অনেক বেশি ব্যস্ত। কোথাও বাঘ নিশ্চিন্তে একটু বিশ্রাম করছে, কি দিবানিদ্রায় রাজবপুখানিকে এলিয়ে দিয়েছে, বানর তখন নিরাপদ উঁচুতে বসে সন্ধান করছে নিকটে কোথাও শূকর আছে কিনা।

বন্য শূকর ঠিক বদমেজাজী নয়। তবে চটিয়ে দিলে সে একেবারে দক্ষযজ্ঞ শুরু করবে। খালের এক হাঁটু কাদায় কিংবা জলার ধারে কোন শূকরের পাত্তা পাওয়া গেল তো বানর সুড়সুড় করে চললো সেখানে। সুমুখে গিয়ে এমনি ভঙ্গি করবে যেন শূকরকে সে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছে আর মুখে বলবে, 'খ্যাক্-খ্যাক্-খো-ও'। বানরের এই ন্যাকামি বরদাস্ত করা শূকরের ধাতে সয়না। কিন্তু যেই না শূকর তেড়ে আসে অমনি ভোঁ দৌড় দেবে বানর। বেগতিক দেখলে লাফিয়ে উঠবে কোন গাছে। আবার কিছুটা দূরে যেয়ে সেই যুদ্ধং দেহি ভাব, সেই ধাবন এবং প্রয়োজনমতে বৃক্ষে আরোহণ। শূকরও কাঠ গোঁয়ারের জাত। বুদ্ধিটাও বড় ভোঁতা। এমনি করে সে এসে পড়ে বাঘের আস্তানায়। তারপর দুই জন্ম-শত্রুর মোলাকাৎ ঘটলেই একটা ফয়সালা করাও অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ওদের শাস্ত্রে সন্ধি নেই। সুন্দরবনের বাঘের ক্রুদ্ধ গর্জন—রণ-হুঙ্কার। মনে হয় মাটি কাঁপছে, গাছগুলো প্রতিধ্বনির সাথে পাল্লা দিয়ে কেঁপে মরছে। যে বানর ছিল এতক্ষণ নারদ মুনির ভূমিকায় এবার সে ভয় পায় লড়াই দেখে, নিঃশব্দে নিচু ডাল ছেড়ে ক্রমাগত লাফিয়ে চলে উঁচু থেকে আরও উঁচুতে। হুড়োহুড়ি করে লাফিয়ে চলতে কেউ হয়তো দৈবাৎ মাটিতে পড়লেও পড়তে পারে। বৃন্তচ্যুত ফলের মত খসে পড়ে না ঠিকই। বনের এলাকা-গুলো যিনি বার কয়েক অন্তত চৌহদ্দী করে বেড়িয়েছেন তিনিই জানেন, শিকারীর সাথে শিকার বাসা বাঁধে না একই এলাকায়।

গাছের ডালে বানর আর গাছের নিচে বাঘ এমন দৃশ্য বনে বিরল নয়তো। বানর কিন্তু সত্যিই ডরায় অজগরকে, হরিণ ডরায় বাঘকে ; বাঘ শূকরের সম্পর্কটা মধুর নয়। ঠিক তেমনি আদা-কাঁচকলার সম্পর্ক বাঘ আর অজগরে। একটু সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে দেখলেই দেখা যায়— বানর অজগরের অধ্যুষিত অঞ্চলে পা দেয় না ভুলেও, বাঘও নিতান্ত বেপরোয়া না হলে খালের কাদায় পা দেয় না। তবে সে যে সুন্দরবনের রাজ অধিরাজ। রাতের আঁধারে তার বড় বড় দুটো হলদে হিংস্র চোখে যে আগুন ঠিকরে বেরোয়, তাকে ভয় করে না এমন অরণ্যচারী কেউ আছে কিনা, কি জানি! তবে গাছের বানর সে-চোখ দেখতে পায় না। পেলেও সাড়া দেয় না। শুধু বন্দুকের আওয়াজে ওরা হুটোপুটি শুরু করে দেয়। কাকেরা কলরব করে উঠলে 'খ্যাক্-খ্যাক্' শব্দ করে ওরা ধমকায়। সে যাক। কথায় কথা বেড়ে চলেছে।

ষাঁড়ে ষাঁড়ে এমনি লড়াইটা দেখতে পেলুম না বলে দুঃখ নেই। আমি জানি যুদ্ধশ্রান্ত বাঘের এই একটানা গোঙরানির অর্থ কি! উত্তেজনার আতিশয্যে কখন যে গোছগাছ করে সাজানো ডাল-পালার কৃত্রিম আবরণ সরে গেছে তার খেয়াল ছিল না। সুমুখের গাছটার উপর নজর পড়তেই দেখি কৌতূহলী চোখ মেলে আমাদের চেয়ে দেখছে একপাল বানর। কি জানি, ডারুইন তত্ত্বের সত্যাসত্য যাচাই করছিল কিনা। খবরটা ততক্ষণে পৌঁছে গেছে পালের গোদার কাছে। কোত্থেকে লাফিয়ে এসে হাজির হলো গোদা আর গোদানী। গোদা একবার কটমট করে চাইলে। তারপর ওর সুমুখের ডালটা ধরে সজোরে নাড়া দিতেই আমি মুখের উপর তর্জনী তুলে বলি, 'চুপ'। গোদা অমনি হাঁক ছাড়ে 'হুপ্-হুপ্'। গোদানী কিন্তু আমার অনুকরণে মুখের উপর তর্জনী রেখে ঘন ঘন ঠোঁট ফোলাতে থাকে। উপর থেকে ময়না হাসে, 'হাঃ-হাঃ-হাঃ'—পালশুদ্ধ সবাই ঠোঁট উলটে হাসে 'হা-হা-হা'। নিজেও হাসতে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ খেয়াল হলো অনেকক্ষণ থেকেই অচেতন হয়ে আছে শিখা।

সাত

কাছারির ঘাটে সবেমাত্র নোঙর ফেলেছে নৌকা—সুন্দুরী এসে শুরু করে দিল কান্না। নাকে কাঁদুনি নয়—একেবারে মড়াকান্না। কাঁদবার কিছু কারণ ছিল না এমন কথা বলছি না। তবে সেকথা ফাঁস করবে না সে কিছুতেই। কাছারির বরকন্দাজেরা সুন্দুরীকে রীতিমত সমীহ করে চলে। আর বুড়ো পেস্কার মশায় তো সুন্দুরীর ভাবী বাসস্থান রৌরব নরকে নির্ধারণ করে ওর ছায়া মাড়াতেও নারাজ। সুন্দুরীও বোধ হয় এমনি ভিড়ের মধ্যে ওর এমন একটা কথা বলতে গররাজী। শেষ পর্যন্ত সে রাজী হলো। হাতের উলটো পিঠে চোখের জল মুছে এগিয়ে এলো সুন্দুরী। বললে, খোঁয়াড় থেকে ওর ধুমসীকে টেনে নিয়ে গেছে রাক্ষুসে বাঘ। কিন্তু শুধু ধুমসীর জন্যে এই কান্না নয়, ওর সেই মনের মানুষটিকেও পাওয়া যাচ্ছে না রাত দুপুরের পর থেকে।

কিন্তু যাক সে কথা। ধুমসীকে বাঘে নিয়ে গেছে সত্যি। খোঁয়াড় থেকে গোবর-ছড়া ছিটিয়ে দেবার মত রক্তের দাগ। কিন্তু অমন প্রকাণ্ড চেহারার হৃষ্টপুষ্ট একটা গাই গরুকে টেনে নিয়ে সে গেলই বা কোথায়? আর সে চিহ্নই বা কই যা দেখে বুঝবো কোন পথে সে গেছে। মহা ফাঁপরে পড়লুম। সুন্দুরী রাগ করে বলে, 'এমন রাজার রাজত্বি বাস করে সুখ নেই; তেমন পেরতাপী রাজা চাই যার রাজত্বি বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাবে।' অন্তত পথে ঘাটে বাঘে মানুষে মোলাকাৎ হলে বাঘ সেলাম করে মানুষকে পথ ছেড়ে দেবে। তার ঘরের মরদকে যদি বাঘে ধরে থাকে—সুন্দুরী গলা ছেড়ে কাঁদে। ওকে তো বোঝান দায়! নইলে বাঘ মানুষকে পুরোদস্তুর সমীহ করে চলে, একথাটা হলপ করেও বলতে পারি।

বাঘ মানুষ মারে পেটের দায়ে, কিন্তু মানুষ বাঘ মারে সখ করে—আত্মরক্ষার তাগিদে প্রায়ই নয়। তাই বাঘ মানুষ মারে—এই কথাটা যত বড় সত্যি তার চাইতে বড় সত্যি যে মানুষকে না মারতে হলেই সে বেঁচে যায়। আসামের বা চিন্দওয়ারা জঙ্গলের চিতা কেন, সুন্দরবনের রয়ালবেঙ্গল রাজপরিবারও মানুষকে রীতিমত এড়িয়ে চলে। বনের বাঘ—মানুষের সঙ্গে পরিচয় নেই তার। হঠাৎ তার চতুষ্পদ অধ্যুষিত এলাকায় দ্বিপদীর দর্শন পেলে সে প্রথমটা খুব ঘাবড়ে যায়। কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে এই অদ্ভুত দর্শন জীবটির জাত গোত্র স্থির করে নেয়। তারপর তার সাম্রাজ্যে অনধিকার প্রবেশের জন্যে সে রাগে ফেটে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত সে যে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটা নিতান্তই ওর স্বভাবের তাগিদে।

একবার কেন, কয়েকবারের এই নজির থেকে একথা আমি এখন নিঃসংশয়েই বলতে পারি। হরিণের উপর কিংবা ওদের যূথমধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে বাঘ নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে চলেছে—সেটা তার শিকার ধরবার কৌশল। ভয়ের বলাই নেই সেখানে। শুধু সুযোগ মত ঝাঁপিয়ে পড়বার অপেক্ষা মাত্র। কিন্তু বাগে পেয়েও বাঘ মানুষের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। একেবারে মুখোমুখি হঠাৎ মোলাকাৎ হয়ে গেলে বাঘ রাগে গরগর করে। তবু হঠাৎ ঝাঁপ দেয় না। অন্তত ওর আক্রমণের আগে বেশ কয়েক মিনিটের একটা ফাঁক পড়ে। বন্য শূকর বাঘের বড় নাছোড়বান্দা শত্রু। আর যুদ্ধে জয়পরাজয় অনিশ্চিত জেনেও বাঘ কিন্তু শূকরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেরি করে না এতটুকু। শূকরকে সুমুখে দেখলে ওর রাগ হয় ঠিকই। কিন্তু সে রাগে গরগর করে না যেমনটি সে করে মানুষের বেলায়। একটিমাত্র হুঙ্কার ছেড়েই তারপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষের উপর—অবিশ্যি গুলি খাওয়া বাঘের কথা আলাদা। ময়নার ঘাড়ে যখন সে লাফিয়ে পড়েছিল, ঠিক সেই মুহূর্তটি আমি চোখে দেখিনি।

ময়নার মুখেই পরে শুনেছি যে আহত বাঘটা অতর্কিতে লাফিয়ে পড়েছিল ওর ঘাড়ে এতটুকু জানান না দিয়েই। নিরুপায় ময়না যখন বাঁ হাতের কনুই ওর গালের মধ্যে সজোরে ঢুকিয়ে দিলে তখনই বাঘ শুধু ছোট্ট একটা হুঙ্কার ছাড়লে। কালী কপালীর ঘাড়েও দু দুবার লাফিয়ে পড়তে দেখেছি। আহত বাঘ গর্জন করেনি সেবারেও। বাঘ-অজগরের জীবন-মরণ যুদ্ধেও কিন্তু বাঘ রণে ভঙ্গ দেয় না। শূকরের সঙ্গে লড়াইতেও নয়। কিন্তু বনের বাঘ মানুষকে এড়িয়ে চলে। তাবলে ভয় পেয়ে সে দূর বনে সরে যায় এমনটিও নয়। মানুষের সম্পর্কে কৌতূহল ওর প্রচুর, লোভও বড় কম নয়। এই কৌতূহল আর লোভের বশে সে মানুষের উপর নজর রেখে দূরে দূরে চলে। আক্রমণ করবার মত সাহস হঠাৎ সে সঞ্চয় করে উঠতে পারে না। তবে যে কদমতলী বনকর অফিসের এলাকায় 'কূপ' থেকে কতবার সে কুলিদের অপহরণ করে নিয়ে গেছে—সে কথার জবাব কি? এমন জ্বল-জ্যান্ত নজির সুমুখে রেখেও বলা যায় যে, মানুষকে সে অপহরণ করেছে চোরের মত। রাবণ রাজার সীতা হরণ যেন।

একটু তলিয়ে দেখলেই ওর চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সরকারী কূপ—কাজ শুরু হবার পর প্রথম চার পাঁচ দিন এমন কি সপ্তাহ অবধি একটি মানুষও বাঘের কবলে পড়েনি। তারপর রোজই প্রায় কেউ না কেউ নিখোঁজ হতে থাকে। অসাবধানী কোন কাঠুরিয়া, দল ছাড়া কোন কুলি—একটির পর একটি নিঃশব্দে উধাও হচ্ছে। পাহারায় শিকারী আছে বটে। কিন্তু শত চেষ্টাতেও বাঘের সন্ধান পাওয়া ভার। কুসংস্কার বশে শিকারী, কাঠুরে, কুলি সবাই ভাবে এ বনের ডাইনীর মায়া।

আসলে কিন্তু তা নয় মোটেই। বনে মানুষের উপস্থিতি বাঘের চোখ এড়ায় না। কৌতূহলের বশে সে তখন মানুষের কাছেপিঠেই ঘোরাফেরা শুরু করে। মানুষের চাল-চলন, হাবভাব, ছলাকলা বা

বলাবল সম্পর্কে যতক্ষণ না তার পরিচয় ঘটে ততক্ষণ সে মানুষকে পুরোদস্তুর ভয় করেই চলে। মানুষের হাতিয়ারের কাছে তার বল ব্যর্থ সে তা জানে। তাই ছলের আশ্রয় নিয়ে সবচাইতে নিরস্ত্র, সবচাইতে অসাবধানী মানুষকে তার শিকার বানায়। বন্দুকওয়ালা শিকারীর ধারেও সে ঘেঁষে না। অথচ শিকারীর চোখে ধুলো দিয়ে সে নিঃসাড়ে এক একটি শিকার মুখে তুলে নিয়ে যায়। সে নিজে এমনি চোরের মত আসে যে এতটুকু শব্দ হবে না কোথাও। এমনি অতর্কিতে সে শিকারের ঘাড়ে কামড় বসাবে যে শিকারও এতটুকু শব্দ করবার ফুরসৎ পাবে না।

মানুষের মাংসের প্রতি তার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আছে—এমন কিন্তু মনে হয় না। তবে সে একবার যখন মানুষ শিকার করে নিরাপদে আস্তানায় ফিরে যায় তখন সে বোঝে মানুষ শিকারের চাইতে নিরীহ সম্বর শিকারও ঢের ঢের বেশি কঠিন। তাই এই সহজ পথ ছেড়ে সে শৃঙ্গী বা দন্তীদের নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চায় না। গাছের উপরকার বানরদের লম্ফঝম্ফ আর আকাশে উড়ে বেড়ানো পাখিদের গতিবিধি লক্ষ্য করে বাঘ বনের ভিতর মানুষের উপস্থিতি টের পায়। পাকা বনঘুঘুরাও তেমনি জানে বাঘ যদি নিকটে কোথাও থাকে তো বানরেরা মাটিতে নেমে খেলা করে না, বনমোরগের দল ঝাঁক বেঁধে চলে না। কিন্তু সে যাক।

মনুষ্য মাংসের প্রতি বাঘের যতই কেন না পক্ষপাতিত্ব থাক, বনের বাঘ বন ছেড়ে লোকালয়ে আসে না। বহু কষ্টেও যদি সে দুবেলার দুমুঠো যোগাড় করতে না পারে তবুও সে বন ছাড়ে না। বাঘ বন ছাড়ে না, ছাড়ে বাঘিনী। আর সে ঠিক প্রসবকালের কিছু আগে। রাতের আঁধারে নদীতে সাঁতার দিয়ে এপারে এসে মনোমত একটা আস্তানা খুঁজে নেয় সে সবার আগে। দিনের বেলায় সে বাসা ছেড়ে বেরোয় না প্রথমটা। এমন কি অদূরে গৃহপালিতের দল চরে বেড়াচ্ছে দেখেও সে চুপটি

করে তার আস্তানায় বসে জিভের জল মাটিতে ঝরায়। রাগ করে জিভটাকে আঁচড়ে দেয় কখনো বা। তবুও বাইরে বেরিয়ে একটা ছাগলের ঘাড়েও কামড় বসাতে সাহস পায় না সে।

তার সব চাইতে ভয় পাঁচন হাতে ঐ রাখালকেই। রাতের আঁধারে ছোট্ট জংলী গাঁ যখন ঘুমিয়ে পড়ে, নেংড়া কুকুরগুলো ছাইগাদায় কুণ্ডলী পাকিয়ে ঝিমুতে থাকে তখনই বাঘিনী তার বাসা ছাড়ে। চুপিসাড়ে গাঁয়ের মেঠো রাস্তার ধার থেকে একটা তুটো কুকুর মুখে তুলে নিয়ে চট করে সরে পড়ে। কুকুরগুলো যদি দল পাকিয়ে সোরগোল করে সে ভয় পেয়ে লেজ গুটিয়ে চলে বাসার পথে। ক্রমে সাহস বাড়তে থাকে। ওর চরে বেড়ানোর সময়ও বাড়ে। কুকুর ছেড়ে তখন নজর পড়ে গেরস্তের খোঁয়াড়ের উপর। ছোট্ট বাছুর, ছাগল, ভেড়া এমন কি হাঁস মুরগীকেও সে রেহাই দেয় না। তা বলে গরু মহিষকে সে আক্রমণ করতে সাহস পায় না তখনও। দীর্ঘকাল ওৎ পেতে থাকা কিংবা শিংওয়ালা জানোয়ারের সঙ্গে লড়াইতে নেমে পড়া সে যুক্তিযুক্ত মনে করে না। বিত্যুৎ গতিতে সে আসে। মুহূর্তের মধ্যে শিকার মুখে নিয়ে ছুটে পালায়। আরও সাহস বাড়ে। আর সুরু হয় বড়দের পালা।

ইতিমধ্যে তার শিশুর জন্ম হয়েছে। দিনে দিনে শশীকলার মত বাড়ছে বাচ্চাটি। এখন আর ছোট শিকারে তুটি পেট চলতে চায় না। তাই বড়দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। মানুষের সঙ্গে ওর পরিচয়টা এতদিনে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। দিনের পর দিন সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে মানুষকে লক্ষ্য করেছে। দূরের কোন হাট থেকে যখন দল বেঁধে ভেড়ীর পথ বেয়ে চলেছে মানুষ, তখন বাঘিনী হয়তো ঠিক ঐ ভেড়ীর নিচেটাতেই কেওড়া বা গেঁয়ো গাছের ঝোপটাতে এক হাঁটু কাদায় বসে ওদেরই উপর নজর রেখেছিল। গুঁড়ি মেরে সন্তর্পণে কিছুটা পথ ওদের পেছু চলেছিলও বটে। এমনি করে

নিত্য সন্ধ্যায় বেরিয়ে হঠাৎ একদিন সে পেল নিঃসঙ্গ একটি মানুষকে। হাতে একগাছা লাঠি আছে পথিকের। বাঘিনী একবার ভেবে দেখলে। তারপর চুপিসাড়ে চট করে বসিয়ে দিলে এক কামড়। ছোট্ট একটা গোঙরানি বড় জোর। তারপর শিকার টেনে নিয়ে চললো ওর আস্তানায়। ঐ পর্যন্তই কিন্তু। দিনের আলোতে বেরুতে সে তখনও নারাজ।

এদিকে বাচ্চাটা বেশ বড় হয়ে উঠেছে। হঠাৎ এক এক সময় বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে বাচ্চাটা। দুরন্ত শিশু—মানে না মায়ের মানা। মা ধমক দেয়। ঘাড়ের চামড়া ধরে টেনে ফিরিয়ে আনে আস্তানায়। কখনও বা রাগ করে ওর চ্যাপ্টা মাংসল থাবা দিয়ে চড় চাপড়টাও লাগায়। অবুঝ কি তবু বুঝতে চায়, না বাগ মানে? শেষ পর্যন্ত বাঘিনী বাচ্চাকে নিয়ে বেরোয় শিকার শেখাতে। অতি মাত্রায় হুঁশিয়ার হয় বাঘিনী বাচ্চার কল্যাণের জন্যে। হামাগুড়ি দিয়ে বুকে হেঁটে ঝোপঝাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করে মায়ে-পোয়ে ওরা এগুতে থাকে অদূরের ঐ মাঠটার দিকে। ওখানে গৃহপালিতের দল নিশ্চিন্তে চরে বেড়াচ্ছে। অমনোযোগী রাখাল ছেলে গোচারণ ছেড়ে তখন কোন গাছের আগডালে বসে ফল খাচ্ছে কিংবা বাবুই পাখির বাসা খুঁজে বেড়াচ্ছে। সুযোগ বুঝে একটা ছাগল কি ভেড়া মুখে তুলে নিয়ে বাঘিনী গা ঢাকা দিলে।

বাচ্চাটা এখন মায়ের সঙ্গে সমানভাবেই শিকারে অংশ নেয়। কৈশোরের রক্তে জেগেছে নতুন উন্মাদনা। বলিষ্ঠ পঞ্জরের উদ্ধত পেশী উঁচিয়ে এখন সে শিকারের উপর অনায়াসেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। আত্মবিশ্বাস একদিন কিন্তু হয়ে দাঁড়ায় অবিমৃষ্যকারিতা! মায়ের কথা কানে না তুলে ভরদুপুরেই সে হানা দিলে গোরুর পালে। লম্বা শিংওয়ালা ষাঁড়েরা সেদিন এই নতুন শিকারীকে যোগ্য অভ্যর্থনা করতে এতটুকু কসুর করেনি। খোঁড়াতে খোঁড়াতে প্রাণ নিয়ে সে

কোনমতে পালিয়ে এলো মায়ের কাছে। এর পর দিন কয়েক তাকে একাই থাকতে হত আস্তানায়। এখন আর সে বেহিসেবী নয়। একদিন তারপর কোন এক রাখাল তার সুমুখে পড়লো। শত্রুকে সে জখম করেছে কিংবা হত্যা করেছে। কিন্তু এমনি ভয় পেয়েছিল মনে মনে যে শিকার মুখে না নিয়েই পালিয়ে এসেছে সে। আফশোষের কথাই বটে। কিন্তু তার মনে আজ আনন্দও বড় কম নয়। আজ সে প্রথম বুঝলে যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে তার এই দ্বিপদী শত্রুটি অজেয় নয়। অবিশ্যি কালী কপালীর সঙ্গে যে বাঘটির মোলাকাৎ হয়েছিল প্রথম, তার অভিজ্ঞতা একটু উলটো রকমের হয়েছিল বৈকি। কিন্তু কালী কপালীদের সংখ্যা মনুষ্যকুলে তো আর বেশি নয়! মানুষের ভয় মন থেকে মুছে যাবার পর শিকারীর চোখকে ফাঁকি দেবার কৌশলটা ওরা শিখে ফেলে। ময়না শিকারী ওদের হাড়ে হাড়ে চেনে। তাই কথায় কথায় বলে যে এই মানুষ-খেকোদের মারা বড় দায়। বনের বিশটা শিকার করতেও এত মেহনত হয় না।

আবাদী মহলের মানুষ বাঘের গোত্র নির্ণয় করতে ভারী ওস্তাদ। গোত্রান্তরে ওরা তিন প্রকার—যথা 'বুনো', 'গোরুখেকো' আর 'মানুষখেকো'। এই গোত্র বিভাগে অবিশ্যি কিছুটা ফাঁক আছে। গোরুখেকো বাঘ মানুষ পেলে ছেড়ে কথা কইবে কিংবা মনুষ্য মাংসে যার রুচি সে গো-মাংস ভক্ষণ করে নরকে যাবার ভয়ে গৃহপালিতের ছায়া মাড়াবেনা এমন নয়। তবু এই গোত্রভেদ ব্যাঘ্র-চরিতের ক্রমবিবর্তনের কথা বলে একেবারে নিরর্থক ভেবে নাকচ করা চলে না।

সুন্দুরীর কথা নিয়ে শুরু করেছি, সুন্দরবনের বুনো বাঘ নিয়ে তো নয়। লোকালয়ের আশপাশে যারা আস্তানা গেড়েছে তাদের প্রসঙ্গেই এত কথা। সুন্দুরীর ঘরে সিঁদ কেটে যদি সে মানুষকে মুখে নিয়ে গেছে, তাহলে ধুমসী গাইয়ের অকস্মাৎ অন্তর্ধানের রহস্যটাই

বা কি ? অমন হৃষ্টপুষ্ট একটা গোরু আর একটা জোয়ান মানুষকে একসঙ্গে মুখে নিয়ে গেছে বলেও তো বিশ্বাস হয় না। তাজা রক্তের চিহ্ন ধরে বাঘের আস্তানায় হাজির হওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু সে নিশানাই বা কোথায়! যাহোক, সুন্দুরীর কাছে জাবাবদিহি না করি, নিজের মনের কাছে কৈফিয়ৎ দেবো কি ?

ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে বিশখানা গাঁয়ের শিকারীদের জড় করেছি কাছারিতে। শিকারীরা স্বীকার করে—মাসাবধি কাল ধরে এক গাঁয়ে না এক গাঁয়ে বাঘ পড়ছে রোজই। ভেড়ীর পথে একটা না একটা মানুষকে সেলামীও দিতে হচ্ছে ঠিক। একপাল বাঘ দশ ক্রোশ এলাকা জুড়ে হানা দিচ্ছে কোথাও না কোথাও। বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়ের পুজো দেবে ওরা আগামী অমাবস্যায়। দক্ষিণরায় খুশি হলে তাঁর বাহনগুলিকে আবার বনে যেতে আদেশ করবেন নিশ্চয়। ব্যাঘ্র দেবতার পুজোটাও হবে বড় জাঁকালো রকমের। একান্নটি মুরগী আর এগারোটি ছাগল জবাই দেবেন পুরোহিত। সুতরাং অমাবস্যা আসবার আগেই একটা ফয়সালা করতে পারলে তবেই ব্যাঘ্র দেবতার বুদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব।

ওদের হিসেব মত হানাদার বাঘের সংখ্যা কমপক্ষেও এক কুড়ি। কিন্তু বিবরণ মত ঐ এক কুড়ি হানাদার একই রাতে ছুখানা গাঁয়ের মধ্যেই তাদের শিকার সীমাবদ্ধ রাখে আর ছুটির বেশি শিকার করে না। ওদের বিশ্বাস দক্ষিণরায়ের নিষেধ আছে বলেই ওরা ছুটির বেশি শিকার করে না আর পালা করেই ঠিক সপ্তাহ পর পর একই গ্রামে হানা দেয়। কথাটা অদ্ভুত, আজগুবি। কিন্তু ব্যাঘ্র-চরিত্র-বিশারদ নিশ্চয়ই জানেন যে, এই সাপ্তাহিকী পরিকল্পনা দেবতা দক্ষিণরায়ের মগজে নেই। আছে বাঘের নিজের প্রকৃতিতে। স্বভাবচতুর বাঘ এক জায়গায় নিত্য শিকার করতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনতে চায় না।

তাছাড়া সীমার গণ্ডীটাকেও সে অন্তত বিশ মাইলের একটা বৃত্তের চাইতে ছোট করেও স্বস্তি পায় না। এই বিশ মাইলের বৃত্ত মধ্যে সে গোটা পাঁচেক ঘাঁটি তো রাখবেই কমপক্ষে। এক নম্বর ঘাঁটিতে আজকের রাত্রি থেকে আগামী কালের সন্ধ্যে পর্যন্ত আস্তানা গেড়ে থাকবে। তারপর যাত্রা করবে দু নম্বর ঘাঁটির উদ্দেশে। এমনি করে বৃত্তাকারে পঞ্চম ঘাঁটি পরিক্রমা করে ষষ্ঠ বা সপ্তম রাত্রে সে আবার ফিরে আসে পয়লা নম্বর আস্তানায়। আর একই রাত্রে যখন দুখানা গাঁ থেকে বড় গোছের দুটো শিকার ওরা প্রায়ই প্যাকড়াও করেছে তখন ওরা সংখ্যাতেও দুটি মাত্র। এক কুড়িও নয়, একটিও নয়।

আমার হিসেব মতই বাঘের দু-দুটি আস্তানায় দু-দুবারই ঐ একজোড়া হানাদারের দর্শনলাভ হলো দেখে আমি নিজেও কম অবাক হইনি। হানাদারদের হত্যা করতে পেরেছিলুম কিনা সে কথা এখন শোনানোর চাইতে সুন্দুরীর কথাটাই বলি।

সুন্দুরীর স্বামীকে এক হাটের গোরুহাটায় যখন আটক করলুম তখন ব্যাচারা তো বড় বোকা বনে গেল। গল্পটা করুণ বটে তবে এমন কিছু চমকপ্রদ নয়। সুন্দুরীর সোয়ামীত্ব বজায় রাখতে হলে ওর আয়ের চাইতে ব্যয়ের অঙ্কটা বড় হয়ে যাবেই। আর সেই বাড়তি ব্যয়ের দায়ে চাষের জমিটাকে নিয়ে টানাটানি করছিল জমিদারের কাছারি। তাই ধুমসীকে হাটে বিকিয়ে জমি বাঁচালে এবারকার মত।

পরের গল্পটা ও ফেঁদেই রেখেছে মনে মনে। সুন্দুরীকে গিয়ে বলবে যে ধুমসীকে বাঘে ধরে নিয়ে যাচ্ছে দেখে সেও ছুটেছিল বাঘের পিছনে। একটা মুরগী জবাই করে তার রক্তও উঠানে ছিটিয়ে এসেছে সে। ধুমসী গাইকে হাটে বিকিয়েছে জানলে অমন সোয়ামীর ঘর করতো কি সুন্দুরী? বেচারার জন্যে দুঃখ তো হবারই কথা। বললুম, 'এবারটা যদি তোমাকে

রেহাই দেওয়া হয় দেনার দায় থেকে!' একগাল হেসে ও বলে, 'তাহলে ধুমসীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই এখুনি। ওকে হাটে দিয়ে যেতে পরাণ ফাটছে যে।'

ধমক দিয়ে বললুম, 'কিন্তু আবার তো কদিন পরে হাটে আসবে দেনার দায়ে।'

গোবেচারার মত আমতা আমতা করে, কথা জোগায়না মুখে।

আট

পাদ্রী পাহাড়ের চূড়ায় চেপে 'লাভারসলীড'-এর কোলে চড়ে ছুচোখ ভরে দেখতুম দূরের ঐ আলো-আঁধারি উপত্যকা। নিচে—অনেক নিচে ঘন নীল অধিত্যকার বুক চিরে ছুটে চলেছে যেন তন্বী পার্বতী—রুবি আর ডিয়াং। রুপোলি জলাধার আকাশের আলোক ঠিকরে দেয়—ঝলমলিয়ে ওঠে রুক্ষ কঠিন উপত্যকা। পশ্চাৎপটে স্থির-স্থবির-ধ্যানগম্ভীর বরাইল পর্বতমালা, উর্ধ্বমুখী মাথা উঁচিয়ে মাউন্ট মহাদেও। ওর যোজন জোড়া জটায় পারিজাতের মুকুট পরায় আসমানের পরী, আকাশের মেঘ শ্বেত-বলাকার শোভাযাত্রা সাজায়, ভগীরথের অলকনন্দা খুঁজে বেড়ায় মর্তলোকের পথ। হাফলং-এর এক হোটেলে বসে আমিও হাতড়ে বেড়াই আমার পথ। অভিসারের পথ—সে ছুর্গম বলেই তো মিলনে এত আকুলতা।

মিকির পাহাড়ের বুক চিরে জাতিংগা উপত্যকার পথ এসে মিলেছে হাফলং-এর নিচের অধিত্যকায়। চোদ্দশ' থেকে চার হাজার ফুটের চড়াই উতরাই পেরিয়ে আসাটা এমন কিছু শক্ত হবে না! প্রস্তাবটা নিয়ে তাই হাজির হলুম সেনসাহেবের বাংলোয়। সেনসাহেব পেশায় ইঞ্জিনীয়ার, নেশায় সাহিত্যিক আর সখে

শিকারী। পেটের সোমরস যদি মগজে ক্রিয়া না করে তাহলে স্বভাব-গম্ভীর। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন—মুদ্রিত চক্ষু, কুঞ্চিত ললাট। আমার প্রস্তাব পেশ করতেই কতকটা যেন আপন মনেই বলেন, 'ও পথে হাতির উপদ্রবটি বড্ড বেশি। নইলে আমার জীপ জলেও চলে আর মা গঙ্গার হেন সাধ্যি নেই যে এই ঐরাবতের দেহখানিকে স্রোতের বেগে ভাসিয়ে নিতে পারেন।

'দরজার পাশ থেকে দোনলাটা তুলে নিয়ে ঠিক আমার নাকের ডগাটা লক্ষ্য করে একজোড়া ফায়ার কর দিকি। হাতি মারবার মত হাতের নিশ্চিত লক্ষ্য থাকলে তবেই ভরসা।'

মনে মনে হেসে ফেললুম। বন্দুকটা তুলে ধরে বাইরের দিকে একটা ফাঁকা আওয়াজ করতেই সেনসাহেব একেবারে লাফিয়ে ওঠেন। নিজের নাকের ডগায় বার কয়েক হাত বুলিয়ে শুধু হাসতে থাকেন তারপর।

জাতিংগা উপত্যকার পথটা হাফলং-এর নিম্ন অধিত্যকায় এসে ওর অজগরের দেহটি দিয়ে ছোট্ট একটি পাহাড়কে পাকে জড়িয়ে তুরন্ত খাদে নেমে গেছে। সুমুখের নিরেট জঙ্গল যেন মানুষের প্রবেশ নিষেধ পরোয়ানা নিয়ে মূর্তিমান পাহারাওয়ালা। ছন্ন-ছাড়া হরিণ শিশুর ছুটে চলার মতো তীরবেগে ছুটে চলেছে সহস্রধারা খরস্রোতা। মাথার উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নিচের পাথরে একটি অতল সাগরের অন্তহীন ঢেউ। জঙ্গলের ঝাঁকড়া মাথার গিঁট পাকানো জটায় গঙ্গাজল গলে না—এতটুকু ফাঁক নেই কোথাও। অবাক হয়ে দেখছিলুম কি কুৎসিত কালো ভ্রূকুটি ওর নীল চোখের পাতায়।

অকস্মাৎ নজরে পড়ল সিগারেটের কটি টুকরো, রান্না মাংসের কখানি হাড়, পাউরুটির পরিত্যক্ত অবশেষ। চড়াই বেয়ে একটানা চলি, আঁধার গুহার পথ হাতড়ে চলি। শালবনের সারি পেরিয়ে আঁকাবাঁকা চড়াইয়ের এক সীমায় এসে তবেই বুঝলুম গোটা একটা

পাহাড় পরিক্রমা করে আমরা তার চূড়োয় এসে ঠেকেছি। উৎরাই পথে নিচের উপত্যকায় দেখা যাচ্ছে একটা জলাশয়, পাহাড়ী লেক হবেও বা। ওরই পাশে বসে মধ্যাহ্ন ভোজ সারবো। কিন্তু পথ কই নিচে নামবার। হঠাৎ মনে হল পাশের পথটাতে যেন হুটোপুটি করছে বুনো জানোয়ারের দল। মাথার উপর থেকে খানকয়েক পাথর পড়ল গড়িয়ে আর সেই সাথে এক পাহাড়ী ছোকরা। হাতির পাল পেছু ধাওয়া করছে। ছোকরা নিচের পথে নামতে থাকে। সেনসাহেব আমাকে ধাক্কা দিয়ে নিচের পথে ঠেলে দেন। মাথার উপর থেকে হঠাৎ ভয়ার্ত কণ্ঠের ডাক আসে 'বাঁচাও-বাঁচাও'।

কে কাকে বাঁচায় ? বাঁচাবার সাধ্যই বা কি আমাদের ? তবুও থামতে হল। ভয়ার্ত ইংরেজ তরুণী আমার হাত দুটো চেপে ধরে আছাড় খেতে খেতে নিচের উপত্যকায় নামতে থাকেন। ওপরের পাহাড়ে তখন হেলে দুলে গজেন্দ্র গমনে চলেছে হস্তীযূথ। ঝোপের আড়ালে বুক পেতে শুয়ে পড়ি। সেনসাহেব বলেন, 'হামাগুড়ি দিয়ে মোটা গুঁড়িওয়ালা গাছটার দিকে এগিয়ে চল। নিচে থাকাটা নিরাপদ হবে না।' গাছের উঁচু ডালে চড়ে পাতার আড়ালে বসে লুকিয়ে লক্ষ্য করি হস্তী বাহিনীকে। ওরা হঠাৎ একসময় দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল দেখে মেমসাহেব ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললে আমার গায়ের উপর। সাহেব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, 'তোমরা আমাদের পিতাপুত্রীর জীবন বাঁচালে আজ।' সেনসাহেব মুচকি হেসে বলেন, 'আসল বিপদটা এখনও এসে পোঁছোয়নি মোটে।' সত্যিই তাই। আধঘণ্টা না পেরুতেই দেখা দিল হস্তীযূথ। সুমুখের লেকটাতে এসে জল পান করল, শুঁড় দিয়ে সারা গায়ে জল ছিটিয়ে তপ্ত দেহ সিক্ত করে নিল। ওরা আমাদের খবর পায়নি ভেবে অনেকটা আশ্বস্ত হলুম। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলুম ওদের চলা ও চরে বেড়ানোর মধ্যে বেশ একটা শৃঙ্খলা বর্তমান। হস্তিনী আর কাচ্চা বাচ্চাদের ঘিরে

জোয়ান হাতিরা সব সময়েই যেন একটা বৃহ বজায় রেখেছে। ওরা চলেই যাচ্ছিল। হঠাৎ অগ্রগামী দলের একজনের নজরে পড়ল আমার চায়ের ফ্লাস্কটি। ওটি যে কখন পিঠ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেছে খেয়াল হয়নি তা। হাতিটা শুঁড় উঁচিয়ে বিশ্রী চেঁচিয়ে উঠল। অমনি থমকে দাঁড়াল গোটা দলটা। মাদী আর বাচ্চাদের ঘিরে তক্ষুণি বৃহ রচনা করে সজাগ দৃষ্টি মেলে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ফ্লাস্কটাকে পায়ে থেঁতলে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে পাথরের গায়ে মারলে এক আছাড়। শেষ পর্যন্ত টুকরোগুলোকে পায়ে ঠেলে ফেলে দিলে লেকের জলে। আবার শুরু হল ওদের পথচলা। তুলকি চালে চলে ওরা দৃষ্টির বাইরে চলে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

হাফলং-এর বন্য উপত্যকা যেন রূপে রসে যৌবন আবেগে উপচে পড়ছে। ওর সেই বাহারী পরিবেশের রং ধরে মানুষের মনে। নামি কি না নামি—এই হল আমাদের সমস্যা। কিন্তু নামতেই তো হবে। সাহেবের হ্যাভারস্যাকে সেনসাহেবের গলা ভেজাবার মত সোমরস আছে। কিন্তু জল নেই আমার তেষ্টা মেটাবার মত। একগোছা লতার দড়ি আঁকড়ে দোল খেতে খেতে নিচে নামছি দেখে মেমসাহেব অকারণ কোলাহল করে ওঠেন। সেনসাহেব শুধু মুখ টিপে একটু হাসেন আর বন্দুকটা মেমসাহেবের দিকে এগিয়ে দেন। অর্থাৎ আকস্মিক বিপদের জন্য সজাগ থাকলেই যথেষ্ট। নিরেট বনকে আমার ভয় নেই বড়। ভয় করে ওর অন্ধ ঝোপগুলোকে, লম্বা ঘাসের কসাড় জংলী মাঠকে। ভয় করছিল না এমন নয়। তবে তৃষ্ণার জল সংগ্রহ করতে হবে। মধ্যাহ্ন ভোজন পর্ব না হয় গাছে বসেই সেরে নেব। বিশেষ করে একজন ইংরেজ তরুণীর বাহবা পাবার লোভ, একজন সাহেব শিকারীর সাধুবাদের স্বপ্ন—সেও কি কিছু কম। জল নিয়ে আবার এসে চড়ে বসলুম গাছে। মেমসাহেব আমাদের সঙ্গে ওঁর মস্ত

বড় টিফিন ক্যারিয়ারটা বদল করতে চান। রাজী হলুম না দেখে মাথার দিব্যি দেন। পুরুষের বেশ ধরলেই নারীর নারীত্ব পৌরুষে পরিণত হয় না। সে বোধহয় অতল সমুদ্রের চাইতে আরও বেশি গভীর। আর শিকারীর ঐ ধড়া-চূড়াতেও সে বেমানান হবে কেন? বোধ হয় ওরা জন্ম-শিকারী।

ছট্ ছট্ ছটাং—এক পাল বাইসন দুধারের নিচু ডালের পাতাগুলোকে নিঃশেষ করে এগিয়ে আসছে। পাথরের রুক্ষ দেহে ওদের খুরের ধার বেজে উঠছে মাঝে মাঝে। এখন ভর দুপুর—জল পানের সময় এসেছে। কি দাম্ভিক চলন ওদের। সাহেব বন্দুক বাগিয়ে ধরতেই সেনসাহেব নলের মুখে হাত চাপা দেন। দুজোড়া শিং-এর লোভে এমন একটি অদেখা দৃশ্যকে হত্যা করবে? একাগ্র দৃষ্টি মেলে দেখছিলুম ওদেরকে। কি সুন্দর সামাজিকতা। গোটা তিরিশেক তো হবেই গণনায়। আত্মরক্ষা বা সমাজরক্ষার তাগিদে কি অপূর্ব ওদের শৃঙ্খলাবোধ। সম্মুখ ও পশ্চাৎদেশ রক্ষা করছে দুটি জোয়ান মরদ। স্ত্রী ও শিশু বাইসনদের দুপাশে দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করে চলেছে সারিবদ্ধ নওজোয়ানেরা। জল পানের সময়টাতেও এই লৌহ বেষ্টনীতে এতটুকু ফাঁক পড়েনি কোথাও। বাচ্চাগুলোর এত কড়া নিয়ম বোধ হয় বরদাস্ত হচ্ছে না। কিন্তু একটু দুষ্টুমি করেছে কি অমনি পাহারাদার বাইসনেরা তাদের লম্বা শিং দিয়ে ঠেলে সারির মধ্যে ফেরত পাঠাচ্ছে। ওরা বিশ্রাম করল না। জল পান সেরে আরও এগিয়ে চলল কোন নির্দিষ্ট আস্তানায়। দূরের একটি গাছের মস্ত গুঁড়ির পাশ থেকে নিঃশব্দে মাথা উঁচিয়ে উঠল একটি গোয়েন্দা চিতা। বার দুই মুখ উঁচু করে ওর সন্ধানী চক্ষু দুটিকে বিস্ফারিত করে বাইসনদের যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে দেখল। লম্বা ধারালো জিভ দিয়ে সুমুখের পায়ের থাবা সাফ করে নিল বোধ হয়। তারপর টগবগিয়ে চলল আমাদের সুমুখ দিয়ে। ওর জিভ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়। পড়বারই কথা। কি নধর

তেল-কুচকুচে চেহারা ওদের। কি কুৎসিত কালো। কিন্তু কে জানতো ঐ কালো রূপেই ওদের মানিয়েছে ভাল। চিতা ওদেরকে হাড়ে হাড়েই চেনে। তিরিশ-পঁইত্রিশ মণ ওজনের ঐ যমদূতের মত কালো জানোয়ারটার মাথার উপরে আছে একজোড়া লম্বা বাঁকানো শিং। ঐ শিং দুটো দিয়ে সে চিতাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে আড়াই হাজার ফুট নিচের কোন কঠিন পাথরে। তাই এই গোয়েন্দাগিরি। অসাবধানী কোন শিশু কৌতূহলবশে কখন যে ছুটে বেরুবে দল থেকে কে জানে। ওরা তো জানে না চতুর চিতার এই উদয়াস্ত অনুসরণের কথা। আর জানা কি এত সহজ। এই তো সে রাশি রাশি শুকনো পাতার উপর দিয়ে টগবগিয়ে ছুটে গেল। একটা খস্‌খস্ আওয়াজ নেই, শুকনো পাতার মড়মড় শব্দ নেই। প্রকৃতি ওকে করেছে স্বভাব গোয়েন্দা। কিন্তু হঠাৎ কেন থামল সে? গুঁড়ি মেরে ঝোপের আড়াল দিয়ে বুকে হাঁটাই বা কেন?

তাকিয়ে দেখি লেকের কোণটাতে জড়ো হয়েছে একদল সম্বর-সম্বরী। সর্দার সম্বর সুমুখের পা দুটো উঁচু পাথরের উপর চাপিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মহামহিম ভঙ্গিতে। সম্বরী তার ছোট্ট দলটি নিয়ে এগিয়ে চলেছে জলের দিকে। জলে ওরা মুখ ছুঁয়েছে কি না ছুঁয়েছে হঠাৎ সম্বরী সচকিত হয়ে উঠল। ছোট্ট একটি ঘুরপাক, ছোট্ট একটি 'ব্যা-ব্যা' ডাক—খোলার খই যেন চড়বড় করে উঠল। তিড়িং-তিড়িং—পলকপাতের আগেই ওরা উধাও হয়ে গেল। এতক্ষণে আবার নজরে পড়ল চিতা। ধীরে ধীরে সে নামল। অকারণে কয়েক চুমুক জল পান করে নিলেও। তারপর শিকারের পলায়ন পথের দিকে চেয়ে রইল উদাসীন দৃষ্টি মেলে।

চোখ তুলে দেখি মেমসাহেবও পলকহীন চোখে তাকিয়ে দেখছেন আমাকে।

নয়
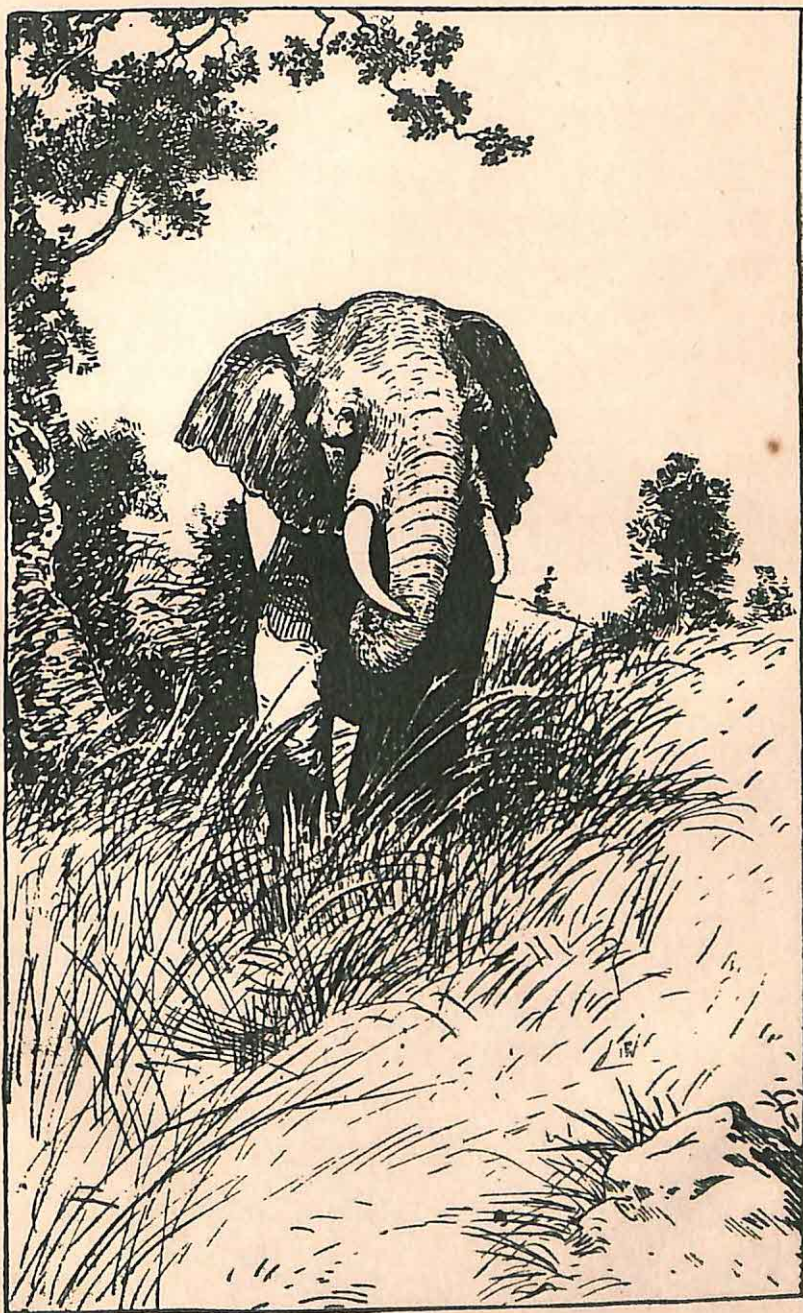
ছাউনি-খোলা ছোট্ট জীপ। ছুটে চলেছে গারো পাহাড়ের গা ঘেঁষে সোজা সড়ক বেয়ে। নধর তেল-কুচকুচে ভুঁড়ির উপর থেকে পাতলুনের বন্ধনী খসিয়ে তবেই যেন কথা বলবার ফুরসুত পেলেন বাসুসাহেব।

—ষাট-সত্তর এখন গা-সওয়া হয়ে গেছে, চাটুজ্যে। কিন্তু পেটে যে সয়না এটা বরাবরই দেখছি। ভূরিভোজনের আণ্ডামণ্ডা শুধু ঘুরপাক খেলেই কথা ছিলনা। কিন্তু তোমার গাড়ির গতির সাথে পাল্লা দিয়ে ওরাও উর্ধ্বমুখে ছুটতে চাইছে, বুঝলে চাটুজ্যে!

চাটুজ্যে কি বুঝলে তা বোধকরি অন্তর্যামীও ঠিক বোঝেননি। গাড়ির গতিবেগ খাটো করবার কোনো লক্ষণই দেখা গেলনা। চড়াইয়ের বন্ধুরতা পেরিয়ে উতরাই পথের মাঝ-বরাবর এসেছি— গাড়িটা সশব্দে একটা আর্তনাদ করেও হিঁচড়ে চললো খানিকটা। বিদ্যুৎবেগে ব্যাকগিয়ারে পিছু হটে ধাক্কা খেল একটা মহুয়াগাছে। বাসুসাহেব গাড়ি থেকে গড়িয়ে পড়েন আর কি!

—আক্কেলটা তো তোমার বেশ দেখছি, চাটুজ্যে! মরি তো চলন্ত মরি! ব্রেক কষে বধ করবে নাকি?

অমিতবিক্রমে হুডটাকে খাড়া করে নিয়ে তবেই মুখ খুললেন চাটুজ্যে সাহেব,—ভোজ্য পেয় সুমুখে রেখে ভোজ্যবস্তুর বেলাতে যদিও বা একেবারে নির্ভেজাল বৈষ্ণব সেজে থাকা যায়—শেষটার বেলায়?

—কখ্খনো না, কখ্খনো না, চাটুজ্যে। রাঙা পানি তো পানি নয়, ও যে অমৃত। বলি, ব্যাপারখানা কি হে? ভয় পেয়েছ মনে হচ্ছে।

—তা কিছুটা ভয় আছে বৈকি। তবে সেটা আমার বা রায়সাহেবের জন্যে নয়।— মুচকি হেসে বললেন চাটুজ্যেসাহেব।

বাসুসাহেব কিছুটা ঋজু হয়ে বসলেন গা ঝাড়া দিয়ে।— এই ভরসন্ধ্যেতেই আমার বপুখানি নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিলে ?

— আমি কি আর করছি — নিস্পৃহের ঔদাসীন্য চাটুজ্যে-সাহেবের কণ্ঠে : আমার গায়ের মোটা হাড়ে ওদের দাঁতই ভাঙতে পারে। আর রায়সাহেবের তনুতে শ্রী যতখানি, মাংসের ওজন তার অনেক কম। দুটো পেটের খোরাক তো আর হবেনা।

— দেখলে রায়সাহেব, দেখলে কাণ্ডটা ! ভাবছে বাসু ভয় পেয়ে এখন বন্দুক কাঁধে করে ওঁকে পাহারা দেবে।— বাসুসাহেবের কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে উঠতে থাকে,— দেখেছে তো দেখেছে, হয় দুটো শেয়াল, নয় দুটো সম্বর, বড়জোর দুটো বনবেড়ালই না হয় হবে। তার জন্যে রাতের ঘুমটাই কি আমি মাটি করবো !

বাসুসাহেব স্বচ্ছন্দে চোখ দুটো বুজিয়ে দেহটাকে এলিয়ে দিলেন পেছনের গদিআঁটা ফ্রেমটাতে।

চাটুজ্যেসাহেব অনেকটা নিরুপায়ের মতো পাশের থেকে দোনলা বন্দুকটা তুলে দেন আমার হাতে।— দু'দিক থেকে দুটো লাফিয়ে পড়লেই যা একটু মুশকিল। বাঁয়ের দিকটাতে একটু নজর রেখো, সাহেব। তা ব'লে সেই একচক্ষু হরিণের মতো নয় কিন্তু।

—বাঘ বুঝি ?

—হ্যাঁ, চিতে-টিতে জাতের হবে। তোমার সুঁদুরবনের মাল এ অঞ্চলে বড় একটা দেখা যায় না। একবার ঐ পুনাখা পাহাড়ের জঙ্গলটাতে একজোড়ার মাদীটা মারা পড়েছিল পাহাড়ীদের হাতে। সেই যা দেখেছি।

—রয়্যালবেঙ্গল—রাজা বাঘ !— অর্ধনিমিলীত চোখে সাড়া দিলেন বাসুসাহেব। —আমার রিভলভারটা হাতের মুঠোয় গুঁজে

দাও, রায়সাহেব। ঘুমের ঘোরে হাতের মুঠো আলগা হয়ে গেলে, হাতের সাথে বরং ওটাকে বেঁধে রেখো। নইলে মরে গেলে ওর স্বজাতি-স্বজন সবাই বাঘটাকে নিন্দে করবে নিরস্ত্র বাসুকে মেরেছে বলে। তা ছাড়া পরলোকে গিয়ে 'শো কজ' হলে একটা হ্যাণ্ডি এক্সপ্লানেশন আমারও চাই তো। যমরাজার সেই হুঁদে কেরানীটা —সেই যে চিত্তির গুপ্ত না কি নামটা—সে আবার ঘুষ না পেলে উলটো গায় শুনেছি। সব বড়বাবুদের ঐ এক ব্যাপার। বলে বসলেই হলো যে, অস্ত্র থাকতেও যখন তার ব্যবহার করোনি তখন সুইসাইডের চার্জটাই বা ক্রেম করা যাবে না কেন?

—এ জন্মে না হোক, ওখানে দু-একখানা চার্জশীট তোমার জন্মে তৈরি হয়ে আছেই।— বললেন চাটুজ্যে বেশ একটু জোর দিয়েই। —আর দেরি নয়, বেরিয়ে পড়া যাক, কি বলো রায়সাহেব? এখানে থাকলেই যে নিরাপদ হয়ে গেলুম তারই বা গ্যারাণ্টি কোথায়?

আশ্চর্য, এইটুকুর মধ্যেই বাসুসাহেবের নাসিকা-গর্জন শুরু হয়ে গেছে। নইলে জবাব দিতে কি আর পেছপা হতেন তিনি?

বাঁকের মোড় ঘুরতেই হেডলাইটের জোরালো আলোয় বেকুব বনে গেল শেয়াল দুটো। বিরাট আকারের সম্বর কি ঐ জাতের যে শিকারটা রাস্তা জুড়ে পড়ে আছে, শেয়াল দুটো তারই গা থেকে মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছিল পরম পরিতৃপ্তিতে।

—ওঃ, শেয়াল!— আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি।

কাঁচা ঘুম ভেঙে বাসুসাহেব অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন,— তাই বলো—শৃগাল! চাটুজ্যে শেয়ালকে বলে বাঘ। বর্ণজ্ঞান নেই, কৌলীন্যের একটা বিচারও কি নেই?

পরিহাসপ্রিয় বাসুসাহেবের এটা যে নিছক পরিহাস নয়, সেটা তাঁর রিভলভারটাকে আঁকড়ে ধরা থেকেই স্পষ্ট হলো। অতবড় শিংওয়ালা জানোয়ারটাকে যে শেয়াল দুটো শিকার করেনি, সত্যি যারা শিকার করেছে তারা গা-ঢাকা দিলেও যে খুব খুশীমনে আমাদের

আশীর্বাদ করছে না, এ কথা বুঝতে কারও দেরি হয় না ; অন্তত সারারাত্রি যারা জঙ্গলে কাটাতে হবে জেনেই পথে নেমেছে তাদের না বোঝার কথা নয়। জীপের সুমুখের চাকা দুটো সবেমাত্র শিকারের ঘাড়ে চেপেছে, বিদ্যুৎবেগে রিভলভার উঁচিয়ে চীৎকার করে ওঠেন চাটুজ্যে। লক্ষ্য নির্ণয়ের অব্যর্থ সন্ধান ছিল মাথার উপরকার জঙ্গলে ধ্রুবতারার মতো জ্বলজ্বলে কয়েকজোড়া চোখ!

— গুলি চালাও, রায়—গুলি চালাও!

পলকপাতে গর্জন করে উঠলো আমাদের হাতের অস্ত্র আর তারই সাথে পাহাড়ের জঙ্গলে প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো মরণাহতের কাতর আর্তনাদ। নলের ডগায় ধূম উদ্‌গিরণ করে অস্ত্রগুলো যেন সদন্তে ঘোষণা করলো যে শিকারের জীবনদীপ নিভে গেছে, শুধু আছে দীপ নেভার পরের রশ্মিটুকু। অন্ধকার রাত্রির বনভূমি মুখর হয়ে উঠলো বিচিত্র কোলাহলে, দূরাগত হিংস্র গর্জন তখন তরঙ্গ তুলেছে বাতাসে।

গাড়ি ছুটে চললো তার গন্তব্যপথে।

রাত দুপুরে মাল জংশনের দোকানদারদের দোর ঠেঙিয়ে যে সের তিনেক মিষ্টির যোগাড় হলো, তাকে আত্মসাৎ করতে একা বাসুসাহেবই যথেষ্ট। পঞ্চপাণ্ডবের জননীর নিতান্ত তাগিদে মধ্যম পাণ্ডব যতখানি ত্যাগ করতেন অনিচ্ছাসত্ত্বে, তার কিছুটা অন্তত ভদ্রতার খাতিরে বাসুসাহেবকে করতেই হলো শেষ পর্যন্ত।

সিভকের পথে পা বাড়াতেই কলরব করে উঠলেন দোকানদারেরা, —সিভকের পথে পা বাড়িওনা, সাহেব। ওসব বন্দুকে টন্দুকে কিচ্ছু হবেনা! শিং দিয়ে একেবারে পাতালে সেঁধিয়ে দেবে। আর তা ছাড়া বুনো হাতির দল বেরিয়েছে। পোষা মাদীদের শিকল ছিঁড়ে দলে ভিড়িয়েছে। সিভকের কলাগাছের লোভে ঐ অঞ্চলেই তো ওরা রাতে আড্ডা গাড়ে বরাবর।

বাসুসাহেব চোখ বুজেই জবাব দেন,—দুগ্যা বলে বেরিয়ে পড়ো
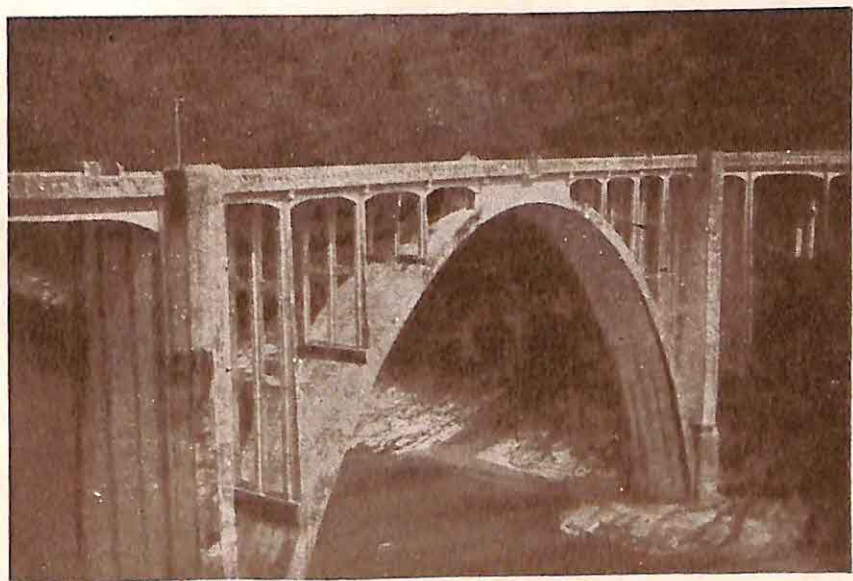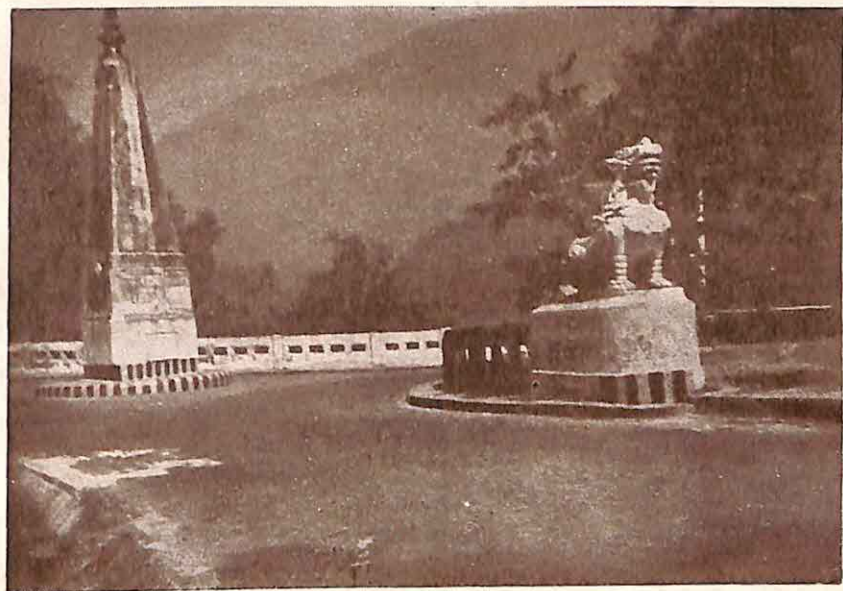
চাটুজ্যে। চাকরিটাকে বজায় রাখতে হবে তো। যমরাজার দপ্তরে ঘুষঘাষ দেবার মতো সম্বলটা হাতে থাকা চাই অন্তত।— ধাবমান যন্ত্ররথের একঘেয়ে শব্দটাকে ডুবিয়ে দিয়ে বেড়ে যায় বাসুসাহেবের গলা।

—আচ্ছা, রায়সাহেব!— চাটুজ্যে বলে,—অমন যে জাঁদরেল ভীমসেনটা সশরীরে সগ্যে যেতে পারলেনা—সে নাকি শুধু পেট ভরে খেতো বলে।

হেসে ফেললুম। —পেট ভরে খেতে পাওয়াটা তো পুণ্যফল, ভারতবর্ষে ওটা বর্তমানে পাপের কোঠায় এসে পড়েছে, কেননা অপরের ন্যায্য ভাগকে ফাঁকি না দিয়ে পেট ভরাবার মতো ভাগ আমাদের কাছে সহজপ্রাপ্য নয়।

—কিন্তু পেটভরা না পেলে মৃত্যুটাও তো অবধারিত। তাতে যে আবার আত্মহত্যার পাপ বর্তাবে। দু'দিকেই যখন পাপ তখন ভরা পেটেই পাপটা না হয় লাগুক। কথায় বলে পেটে খেলে পিঠে সয়। আর রোগা ইঁদুরটি হয়ে স্বর্গবাসের চাইতে হাতি হয়ে নরকে থাকাও ভালো।— শেষটুকু যেন আপন মনেই বলেন বাসুসাহেব।

বেশ যাচ্ছিলুম পাহাড়ের পিচ-বাঁধানো চড়াই ঠেলে। করোনেশন ব্রিজটা পেরুতে যাব, উদ্ধত খুরের ভারি আওয়াজে চমকে দিয়ে ব্রিজের অপর প্রান্তে এসে পথরোধ করে দাঁড়ালো বিরাট আকারের বন্য মহিষ—বরং বলি মহিষাসুর। শিং বাঁকিয়ে বীর পদভরে ব্রিজটাকে কাঁপিয়ে তুলে হঠাৎ তেড়ে এলো—কিন্তু মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ। তারপর পেছু হটে আবার যথাস্থানে গিয়ে ফিরে দাঁড়ালো 'যুদ্ধং দেহি' ভঙ্গিতে।

চাটুজ্যেসাহেব আমাকে সাবধান করে দেন,—নিতান্ত গায়ের উপর এসে না পড়লে গুলি চালাবে না খবরদার। শিং দিয়ে গাড়িটাকে গুঁড়িয়ে দিতে না পারুক, ছুঁড়ে ফেলে দেবে ঐখানে —হাজার দেড়েক ফিট নিচুতে।

গাড়ির হেডলাইট দুটো ওর মুখের উপর রেখে, গাড়িটাকে পেছু হটিয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁষে রাখতে হলো, যাতে সুমুখের ধাক্কায় পেছু গড়িয়ে আমরা গাড়িসুদ্ধ না পড়ে যাই পাহাড় তলের ঐ খরস্রোতা তরঙ্গধারায়। মুহূর্তের জন্য বোধহয় হেডলাইটের আলো ঐ কুৎসিত কালো জানোয়ারটার মুখের উপর থেকে সরে গিয়েছিলো। বিদ্যুৎবেগে মহিষাসুর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলো তার শত্রুদের উপর। খট্ খট্ খট্—মহিষাসুরকে থমকে দাঁড়াতে হলো। তীব্র আলোর ছটা ওর মুখে পড়েছে আবার। ক্ষিপ্ত হয়ে মহিষাসুর পা দিয়ে মাটি আঁচড়ায় আর শিং বাঁকিয়ে যেন দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করে। কখনও বা দু'চার পা তেড়ে আসে, থমকে দাঁড়ায়, পিছু হটে, তারপর মুখ তুলে বুঝে নিতে চায় প্রতিপক্ষের মনোভাব। কী কুৎসিত তেল-কুচকুচে ওর কালো দেহটা! কী বিপুল! দুর্জয় ওর গতিভঙ্গি, দুরন্ত ওর প্রতিহিংসাবোধ, কী শয়তানী ওর চাহনিতে! স্বর্গ-জেতা পৌরাণিক যুগের মহিষাসুরকে স্বয়ং প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখলেও এর চাইতে বেশি বিপন্ন বোধ করতুম না নিশ্চয়ই।

—ওর দলবৃদ্ধি হলে আর নিস্তার থাকবেনা, চাটুজ্যে। এগিয়ে আমরাই ওকে আক্রমণ করিনা কেন?— যুক্তি দেন বাসুসাহেব।

চাটুজ্যে নীরবে পাশের দেড়হাজার ফিট গভীর খাদটাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন।

একপাল সম্বর কি বাইসন হঠাৎ হুড়মুড় শব্দে গোল বাধালো সুমুখের বনটাতে। শিংওয়ালা কি একটা জীব একেবারে ছিটকে এসে পড়লো আমাদের সুমুখের পথটাতে—বড়জোর বিশ পঁচিশ হাত দূরে। পলকপাতে সে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল ছোট্ট একটা লাফে—তিড়িং। হুড়মুড় করে জানোয়ারের দল ছুটে পালালো ঠিক আমাদের মাথার উপরকার জঙ্গলের বনপথে। দুড়-দুড়-দুড় পাহাড়ের বুকের হৃৎপিণ্ডটাও যেন ভয়ে কাঁপতে থাকে। আচমকা

মহিষাসুর তেড়ে আসছে তার উদ্ধত শিং উঁচিয়ে! ছুটে আসছে তীরবেগে—তীরের মতোই সোজা দৃপ্তভঙ্গি। আমার বন্দুক আর তার ক্ষুদে সংস্করণ দুটো একসঙ্গে জবাব দিলে—দুড়ুম-দুড়ুম-দুম-দুম। থেমে গেল মহিষাসুর—কিন্তু সে শুধু একলহমা। দ্বিগুণতর গতিবেগ নিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুড়ুম-দুড়ুম—মরীয়া হয়ে গুলি চালাই আমরা। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চলছে। মহিষাসুরের গতিবেগ খাটো হয়ে এসেছে! তবুও সে কি দমে? না, রণে ভঙ্গ দেয়? দেবী দশভুজার সব দিব্য আয়ুধকে ব্যর্থ করে আঘাত হানলো জানোয়ারটা। আপনা থেকে চোখ দুটো বুজে এলো আমার। গাড়ির সুমুখের চাকা দুটো একটা ঝাঁকুনি খেয়ে আবার যথাস্থানে চেপে বসলো। তারপর সব নিস্তব্ধ।

মহিষাসুর লুটিয়ে আছে মাটিতে। অজস্র রক্তের ধারা ঝরনার জলের বেগ নিয়ে নিচের পথে এসে লাল জমাট দানা বেঁধে উঠেছে। ঘটোৎকচ যেমন একাঘ্নী বুকে নিয়ে কুরুকুল চেপে পড়েছিল—মহিষাসুর তেমনি চেপে পড়েছে আমাদের যাত্রাপথ। কী দুঃসহ প্রতিহিংসা!

বহু পরিশ্রমের পর যখন আবার শুরু হলো আমাদের অগ্রগতি, তখন বনমোরগের ডাকে বন হচ্ছে প্রতিধ্বনিত।

খোলা হুডটার উপরে মাথা হেলিয়ে বাসুসাহেব নিশ্চিন্ত আরামের আমেজে চক্ষু মুদ্রিত করেন—দুগ্যা, দুগ্যা!

দশ

অমরকণ্টক তার যোজনজোড়া জটের গিঁট খুলে রুক্ষ আলুথালু কেশ যেখানে এলিয়ে দিয়েছে, মাটি সেখানে মানুষকে দেয় অকৃপণ মুঠিভরে সোনালী ফসল। এই মাটির সোনার টানে তাই ঘর বেঁধেছে, গাঁও গড়েছে মানুষ মধ্যপ্রদেশের চিন্দওয়ারা আর সিওনি জেলায়। শালপিয়ালের বনে বনে সারিবন্দী পিপুল গাছের পাহারা-ঘেরা ছোট ছোট গাঁও—চন্দপুর, আরামপুর, মালাপুর, হিন্দুপুর, বেলবা, দেওপুরা। আরও কত নাম। সমুদ্রের মাঝে দ্বীপপুঞ্জের মত অখণ্ড বনের মাঝে খণ্ড খণ্ড জনপদ—সোনালী ফ্রেমে বাঁধা এক একটা ছবি যেন। পাহাড়ী বন তার রূপবৈচিত্র্য নিয়ে মাটির হাত ধরেছে এখানে—তাই সে বন্ধুর, অবিন্যস্ত, উৎরাই আর চড়াইয়ের সীমার মধ্যে লীলায়িত। গাছেরা এখানে বিস্তৃতির বহর দেখিয়ে আকাশের আলোকে অযথা রুখে দেয়নি; বরং ঝাঁকড়া মাথা উঁচিয়ে জিরাফী গলা বাড়িয়ে আসমানের চাঁদকে চুমা দিচ্ছে যেন। শীর্ণা পার্বতীর যৌবনবেগ নিয়ে বর্ষায় এই বনভূমিতে সহস্র ধারা ছুটে আসে কলকল্লোলে, আবার গরমের দিনে তারা হারিয়ে যায়। বালির খালে চিকচিক করে একহাঁটু জল, কোথাও বা পাথরের বাহু-বেষ্টনে বন্দী হয়ে ওরা জেগে থাকে একটি হ্রদের মত। সম্বর-সম্বরী দল বেঁধে আসে এখানে তৃষ্ণার জলের সন্ধানে। কচি ঘাসের মাঠগুলোতে চরে বেড়ায় বারশিঙা তার বেগম বাঁদী অমাত্য পরিজন নিয়ে। চিতল তার বিশ্রামরত দলটিকে পাহারা দিচ্ছে কোথাও অভ্যস্ত ভঙ্গিতে পাকঘুরে। গাঁয়ের গা ঘেঁষে চরে বেড়াচ্ছে গেরস্তের গোরু। এই নিরীহ তৃণভোজীদের আবাস বলেই তো আর আরামপুরের অরণ্য আশ্রম তপোবন । তপোবনের শান্তি

আছে হয়তো, কিন্তু বনের বৈচিত্র্য কোথায় পাবে সে?

কাঁটাঝোপের আড়ালে দেহটাকে সংকুচিত করে সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে গুলবাগ বা প্যান্থার, জলের ধারে ঝোপের রঙে রঙ মিলিয়ে ওৎ পেতে আছে হয়তো বাদশাহী মেজাজের শের, চতুর চিতা হয়তো লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কোথাও শিকারের পথ চেয়ে। আবার মাঝে মাঝে হঠাৎ এসে হাজির হয় বনকুকুরের দলও। অরণ্যচারী নির্বিশেষে অভিসম্পাত দেয় এই জংলী কুত্তাদেরকে। অকস্মাৎ যেন নাড়ী ছেড়ে যায় গোটা বনটার। এমন যে একচ্ছত্র রাজচক্রবর্তী শের সেও বন ছেড়ে সরে পড়ে সসম্মানে। গুলবাঘ তার দুর্ভেদ্য দুর্গে বসে হাই তোলে ক্ষুধার তাড়নায়, উপোসী চিতা আশ্রয় খোঁজে গেরস্তের খেত-খামারে। সম্বর-সম্বরী, বারশিঙা আর চিতল উভরড়ে ছুটে বেড়ায় বন থেকে বনান্তরে। গাউর বা বাইসনের দল পা চালিয়ে চলে বনের গভীর থেকে গভীরতায়। ঘন বাঁশের বনে আত্মরক্ষার দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করে ওরা। গোটা বনটার হৃৎস্পন্দন শুধু জীইয়ে রাখে বনমোরগের দল। উঁচু শাখায় চড়ে ওরা অকারণ গলা ফাটিয়ে অরণ্যচারীদের সতর্ক করে বোধ হয়। বনময়ূরী কলরব করে ওঠে মাঝে মাঝে আর কাঠঠোকরা তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে যেন ঢ্যাঁড়া দিতে শুরু করে—সোনা এসেছে, সরে পড়। এদিকে হয়তো ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে সোনার অভিযান। দলবল নিয়ে বনজুড়ে দৌড় শুরু হয়েছে বনকুকুরের। দিন নেই, রাত নেই, ওরা ছুটছে তো ছুটছেই আর অস্পষ্ট একটা 'ঘউ-ঘউ' শব্দ লেগেই আছে মুখে। দুরন্ত দৌড়বীর এরা—দুর্দান্ত গতিবেগ, দুর্জয় এদের ছুটে চলার শক্তি আর অব্যর্থ এদের নিশানা। সবচাইতে বড় বোধ হয় এদের জিদ।

এমনি করে কদিন কাটে। মন্দার পাহাড়ের জগদ্দল সমুদ্রের বুকে চাপিয়ে দেবাসুর মিলে যত বড় মন্থন করেছিল তার চাইতে অনেক বেশি লণ্ডভণ্ড করে এরা। তারপর এই বিদ্যুৎগতি

বিভীষিকার শেষ হলে আবার ধীরে ধীরে ফিরে আসে পলাতকেরা, বনজুড়ে জাগে প্রাণের স্পন্দন। বনের অন্তরঙ্গে যখন এতকাণ্ড বহিরঙ্গে তার ছাপ কিছুটা পড়ে বৈকি। তবে গাঁয়ের জীবনে এমন কিছু নয় সেটা। গাঁয়ের গোরুর পাল চরে বেড়ায় বনের সীমানায়। হঠাৎ একদিন তারা লেজ উঁচিয়ে বড় বড় নিশ্বাস টেনে ভয়ার্ত হাম্বারবে গাঁয়ের মানুষকে হকচকিয়ে দেয়। সেও এমন কিছু নয়। ওরা জানে, গোরুর পালে গুণতিতে একটা কম হবে মাত্র। লম্বা লাঠি হাতে রাখাল এসে নিস্পৃহের মত খবর জানায় পালে বাঘ পড়েছিল। গোরুটাকে বনের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে বা রাখালের লম্বা লাঠির ভয়ে শিকার ফেলে শিকারী পালিয়েছে। কখনও এক আধটা মানুষকে বাঘে মারেনি এমন নয়। রাখাল দু-একজন মারা পড়েছে বৈকি মাঝে মাঝে, দু একটা হাটুরে কাঠুরেও।

কিন্তু এ যে একেবারে ভিন্ন জমানা। সেই কবে মালগুজারের রাখাল আর গোরুকে একসঙ্গে মেরেছিল শয়তান সেই থেকে আজ তিনটি বছর। মহাভারতে লেখা একচক্রা নগরের বক-রাক্ষসের মত শয়তান যেন গাঁয়ের ঘরে ঘরে একটা মানুষ অন্তত বরাদ্দ করে দিলে তার ভোজের জন্যে। কদিন আগেও তো সে পদ্মাকে চুরি করে নিলে। জঙ্গলের দেওকে পুজো দিতে গেছল গাঁয়ের মেয়ে-পুরুষ মিলে দল বেঁধে। ফিরবার পথে পদ্মার পায়ে ফুটল কাঁটা। পায়ে চলা সরু বনপথ জঙ্গল ছেড়ে একফালি মাঠের বুক চিরে এসে মিলেছে গাঁয়ের সীমানায়। বনপথ তো প্রায় পেরিয়ে এসেছি—এই ভেবে পায়ের কাঁটা বার করতে পথের উপর বসে পড়লে পদ্মা। পার্বতী আর মৈনাক ওর পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে। একটা ছোট্ট শব্দ—একটু আর্তনাদ। ব্যস, পদ্মা হারিয়ে গেল চিরদিনের মত।

এই তো সেদিন—জোয়ান মরদানারা দিন দুপুরে দল বেঁধেই

ফিরছিল মালাপুরের মেলা থেকে। এরই মধ্যে কখন যে টেনে নিয়ে গেল বাবলা হাটুরেকে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তবেই সন্ধান মিললো; হাটুরের আধখানা দেহ কাঁধে নিয়ে ওরা ফিরে এলো গাঁয়ে। সেই থেকে দেহাতিরা ওকে মহারাজ মেনে নিয়েছে। কান্ধাই শিকারী জাতে গণ্ড। আর এই গণ্ড উপজাতির মত বনঘুঘু খুব কমই মেলে সংসারে। তা ছাড়া জাওলা বৈগাও এসেছে। গত কবারই তো মন্ত্রের জোরে সে মহারাজকে টেনে এনেছে আমানুল্লা, গরীব সিং এমনকি রাণাসাহেবের রাইফেলের ডগায়। কিন্তু মহারাজ আজও বহাল তবিয়তেই তাঁর নির্মম রাজত্ব কায়েম রেখেছেন। কথাটা কান্ধাই আমাকে বুঝিয়ে বলে। মহারাজ হচ্ছেন জঙ্গল দেওয়ের বাহন। সুন্দরবনের ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের মত এই জঙ্গল দেওটিও বাঘের পিঠে চেপে তাঁর বনরাজ্যের খবরদারী করে বেড়ান। পাঁচখানা গাঁ জুড়ে বিশকোশের একটা এলাকায় মহারাজকে রাজত্ব ভার দেওয়া আছে।

সন্ধ্যে গড়িয়ে চলে নিশুতি রাতে—তবু ঘুম আসতে চায়না চোখের পাতায়। মহারাজ এখানে দিনেরও দুঃস্বপ্ন। আমার রাতের ঘুম যেন মহারাজের গোল গোল চোখজোড়ার হিংস্র দীপ্তি দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে থমকে আছে দরজার বাইরে। শুয়ে শুয়ে সুন্দরবনের ময়না শিকারীকে মনে পড়ে। ধমক দিয়ে ময়না আমাকে প্রায়ই বলতো যে হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ হলেই শিকারী হওয়া যায় না—বুকের পাটায় জোর থাকলেও নয়। আসলে শিকারীর চোখ চাই। কিন্তু আমার এই বেয়াদব চক্ষু দুটি! শিকারের রূপ দেখতে দেখতে প্রায়ই যে শিকার হাতছাড়া হয়ে যায় আমার। ময়না রাগ করে বলে, বনের রূপ দেখতে দেখতে কোনদিন হয়ত বাঘের পেটে গিয়ে বাসা বাঁধতে হবে আমাকে। ময়না মিছে বলে না।

বন যে একটা বিরাট হত্যাশালা। মৃত্যু ওৎ পেতে আছে ওর অন্ধ ঝোপঝাড়ে, পাতার ছায়ায়, পাথরের গুহায়। অমন হ্যাংলার

মত হাঁ করে কি দেখবার আছে সেখানে! ময়নাকে জবাব দিইনি কোনদিনও। কিন্তু মনকে তো দিয়েছি। মানুষের ধরাছোঁয়ার মধ্যে এমন বিচিত্র বিরাটের আভাস কই আর। চাঁদিনী রাতে আসমানের হুরীরা এমন ওড়না জড়িয়ে বেড়ায় না আমার পৃথিবীতে। পায়ের পায়লে রাগরাগিণী বাজিয়ে এমন করে নেচে চলেনা ফুলপরীরা। গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটে ওঠা বনফুলের আলো নেই এখানে। হরিণীর ডাগর চোখের মায়াকাজল নেই মানবীর চোখে—নেই বনময়ূরীর প্রিয়সম্ভাষ। বনলক্ষ্মী কি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীর চাইতে সম্পদে কম না রূপে খাটো। আর হত্যা! মানুষের পৃথিবীতে হত্যার পরিমাপ নেই—অমানুষী পাপের ইতিহাস নেই। কিন্তু অরণ্যচারীর জীবনে লড়ায়ের তাগিদে একটিও নেই অনর্থক অপ্রয়োজনের লড়াই।

কিন্তু থাক ওসব কথা। মালাপুরের মহামহিম মহারাজের কাহিনী শোনাতে বসেছি যে। হ্যাঁ, বাঘিনীর সেই বাচ্চাটি মায়ের সাথে চৌহদ্দী করে বেড়াতে বেড়াতে একদিন হঠাৎ মা ছাড়া হলো সে এই আরামপুরের জঙ্গলে। বয়স তার বেশি হয়নি তখনও নিশ্চয়। মায়ের কাছ থেকেই পাঠ নিয়েছে সে। তাই লাঠি হাতে রাখালকে সে বরাবরই এড়িয়ে চলেছে এতদিন। কিন্তু সেদিন তার পালাবার পথ ছিলনা যে। তাই মরিয়া হয়েই সে মালগুজারের রাখালের ঘাড়ে বসালে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত। ভারি ভয় পেয়েছিল সে প্রথমটা—এত ভয় যে মুখে করে শিকারটাকেও টেনে আনেনি সে। কিন্তু তাতে দুঃখ নেই। আজ অন্তত এইটুকু সে বুঝতে পারলে যে ঐ ক্ষুদে দ্বিপদী জাতটার তুলনায় অনেক বেশি শক্তিধর সে। এর পরে গোরুর পালে আবার যেদিন হানা দিলে সেদিন একজোড়া লাঠিওয়ালা মানুষ তেড়ে এসেছিল বটে। সাত পাঁচ ভেবে দেখবার মত সময় ছিলনা। তবু একবার পরখ করতে সাধ যায় বৈকি—বিশেষ করে পালাবার পথ তো খোলাই আছে। আক্রমণের একটা ভান মাত্র। কিন্তু এতেই তার ঘৃণিত দ্বিপদী

শত্রুদ্বয় ভয় পেয়ে কি দৌড়টাই না দিলে। মানুষ শত্রুর এই কাণ্ড দেখে সেদিন নিশ্চয়ই খুব হাসি পেয়েছিল ওর। এর পর আর পায় কে। শুরু হলো ওর বেপরোয়া হানা—অবিশ্যি গো-মহিষদের উপরে। মানুষকে সে আর ভয় করে না যেমনটি সে দুদিন আগেও করতো। তাবলে মানুষকে আক্রমণ করবার সাহস সে সঞ্চয় করতে পারেনি তখনও।

তারপর একদিন ওর পায়ে লাগল আমানুল্লার গুলি। ডান পায়ের দুটো নলি কেটে বেরিয়ে গেল গুলিটা। উঃ, কি অসহ্য যন্ত্রণা! তিন চার দিন তো আধমরার মত পড়েছিল। তারপর ক্ষিধে তেষ্টার অসহ্য তাড়না। কোনমতে জলার ধারে বুকে হিঁচড়ে নামলো সে। একপেট জল খেয়ে একটু স্বস্তি পেল বটে। কিন্তু সর্বনেশে ক্ষিধেটা যেন আরও বেড়ে উঠলো। ওর সন্ধানী দৃষ্টি খুঁজে বার করলে একটি নিঃসঙ্গ সম্বরকে। বেশ নাদুস-নুদুস তেল-কুচকুচে চেহারা। জিভ থেকে নাল গড়িয়ে পড়বেই শিকারীর। খুঁড়িয়ে কিংবা বুকে হেঁটে এগিয়ে যেতে পারলে—। একটু চেষ্টা শুরু করতেই কিন্তু পায়ের যন্ত্রণাটা এমনি ভীষণ মনে হলো যে গলা থেকে বেরিয়ে এলো একটা কাতর অস্ফুট গোঙরানি। সতর্ক সম্বরও পালিয়ে গেল। আরও কদিন কাটলো এমনি করে। ক্ষিধের জ্বালায় প্রাণটাই যায় বুঝি! এখন তো একটু আধটু চলে বেড়াচ্ছে। তবে চেষ্টা করেও তো একটা খরগোস বা একটা অসাবধানী বনময়ূরকেও ধরতে পারেনি সে। দেহের সব শক্তি যেন উবে গেছে। চোখের সেই অসহ্য জ্বলন্ত দীপ্তিও যেন নিবে আসছে। ঝোপের আড়ালে দেহটাকে কোনমতে টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ে হাঁপাতে থাকে সে। হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে পড়তে হলো তাকে।

মানুষের গলার আওয়াজ না? হ্যাঁ, ঠিকই তো। একশো গজ দূরের সরু পায়ে চলা পথের রেখাটা ধরে চলেছে জন তিনেক কাঠুরে। ভয়ে ওর বুকটা দমে যায়। কিন্তু আহার যে চাই-ই চাই।

অনাহারে মরার চাইতে একটা ঝুঁকি নেওয়া ভাল নয় কি? অনেক দ্বিধা, অনেক ভয়। তবু ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে ওদের পেছু নিতে দোষ কি। লুব্ধ দৃষ্টি মেলে সে ওদের দেখছে। একটু একটু করে ওদের কাছাকাছিও এসে পড়েছে বটে। কিন্তু কিছুতেই ওর সাহসে কুলোচ্ছে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটে। তারপর একটি অসতর্ক মুহূর্তের সুযোগ। রামদীনকে এমন চুপিসাড়ে টেনে নিয়ে এলো সে যে সঙ্গিরা প্রথমটা কিছু বুঝতেই পারে নি। গোগ্রাসে খাচ্ছিল। হঠাৎ আবার মানুষের সাড়া পেয়ে গা ঢাকা দিতে হলো ওকে। দুঃখ নেই তাতে। এ যাত্রা তো মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পেরেছে—এই যথেষ্ট। আমেজে ওর চোখ বুজে আসছে আর ওর স্বভাবজাত বুদ্ধি ওকে তখন কানে কানে বলছে, মানুষ বড় অসহায়। একটু বুদ্ধি খাটিয়ে শিকার ধরলে কত সহজেই না আহার জুটতে পারে!

ঠক্-ঠক্-ঠক্—দরজায় মৃদু করাঘাত যেন কার? হঠাৎ চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল দেখে জানালা দিয়ে মুখ বাড়াই। সেই ফোক্‌লামুখ বুড়িটা—মালাপুর থেকে আসবার পথে কাল ওকে মাঝ-রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। আমার গাড়িতে তুলে এনে ওকে পৌঁছে দিয়েছিলুম ওর ঘরে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'মহারাজকে ভয় করনা তুমি?' বুড়ি একগাল হেসে শুধু মাথা নেড়েছিল। বুড়ি আজও তেমনি হাসে। তারপর চুপি চুপি বলে, 'এই ভোরেই কেন এসেছি জান? কেউ জানতে পাবে না তাই। মহারাজকে মারতে এসেছ জানি। কিন্তু সে তোমার সাধ্যে কুলোবেনা। এই মাদুলিটা কাছে রাখ। যেদিন চন্দপুর ছেড়ে চলে যাবে সেদিন আবার ফেরত দিয়ে যাবে কিন্তু। আমার নাতি বড় হলে ওকে দিতে হবে তো।'

অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি দেখে বুড়ি মাদুলিটা হাতে গুঁজে দেয়। 'হুঁসিয়ার, এটাকে কাছছাড়া করোনা এক লহমার জন্যেও।

আর এখানে একথা কাউকে বলোনা যেন। আমার কর্তা এরই যাদুতে এ অঞ্চলের সেরা শিকারী ছিল। আমার ছেলেও ছিল বাঘার যম।' সস্নেহে আমার চিবুকে হাত দিয়ে বুড়ি বিড়বিড় করে বলে, 'আমার এই ছেলেটিকেও লোকে বলবে বাহাদুর ব্যাটা আমার।'

অরণ্যচারী মানুষ যেদিন তার ভেতরকারের দুর্জয় দৈত্যটাকে আবিষ্কার করে বসল সেদিন থেকেই ময়দানবের মাথা খাটিয়ে বিশ্বকর্মার হাত লাগিয়ে গড়তে শুরু করে দিলে তার একচ্ছত্র দুনিয়া, তার বিশ্বজোড়া রাজত্ব আর অলংকার মোড়া রাজপাট। তার মগজটা মাথা চাড়া দিলেও মনটা তো আর মরেনি। শুধু কুঁকড়ে গুটিয়ে গা ঢাকা দিল তার খোলসের মধ্যে। সুযোগ পেলেই সে আবার খোলার সেই অজেয় দুর্গ থেকে তার চোখ দুটো বাড়িয়ে বাহির বিশ্বে উঁকি দিতে চায়। চোখ দিয়ে যেটুকু সে দেখতে পায় তাতে মন ভরে না। তাই কল্পনাটাকে সে ত্রিভুবনময় দৌড় করিয়ে বেড়ায় অশ্বমেধের ঘোড়ার মত।

তাঁবুর বাইরে একফালি সবুজ। প্রাতরাশের টেবিলে বসে তাকিয়ে দেখছিলুম ওর কাস্তের মত চেহারাটা। গোটা বনটা যেন ওর ঐটুকু মাথার উপর গন্ধমাদন হয়ে চেপে আছে। মনটা তখন মাঠের এলোমেলো ঝোপঝাড়ের মাথা ডিঙিয়ে শাল তমালের তল দিয়ে ছুটছে। দূরবীনটা হাতে নিতে যাব, হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির হল কান্ধাই। বৈগার হিসেব মত মহারাজ তখন বনান্তরে —নির্দিষ্ট বৃত্ত পরিক্রমার কোন দূর পথে। অথচ কান্ধাই তার একনলা গাদা বন্দুকটা বারবার মাটিতে ঠুকে বলছে কিনা হলপ করে। কান্ধাই মন্তর-তন্তর জানেনা বৈগার মত। তাবলে সে বনঘুঘু তো বটে। অরণ্যের অন্দর মহলের ছকটা যেমন তার নখদর্পণে তেমনি আরণ্যকদের আহার-বিহার, রুচি-অরুচি, চাল-চলন, দিনের ডেরা, রাতের আস্তানা—সব কিছুরই সে জানে নির্ভুল নিশানা! মান্ধাতার আমলের একনলা বন্দুকটাকে কাঁধে চপিয়ে

দিব্যি চলেছে কান্ধাই। মুখে তার এমন নির্বিকার নিরাপত্তার ভাব যে অবাক না হয়ে পারলুম না।

বন-ভৌগোলিক অখণ্ডতার কথা তুলে কেউ যদি অমরকণ্টকের আসল অংশ বলে একে অস্বীকার করেন আপত্তি করবোনা। কিন্তু অংশ তো বটে। সুতরাং স্বভাবেও সে সমগোত্রীয়। সুন্দরবনের মত সমতল নয় এর জমীন, নরম নয় ওর মাটি, নিরেট নয় এর জঙ্গল। তবে এতক্ষণ যেটুকু পেরিয়ে এলুম সেটুকু বন নয়, বরং উপবন। বহুখণ্ডিত এই এলাকাগুলো জুড়ে আগাছার এলোমেলো জঙ্গল, কেয়ার মত কাঁটাবন আর শাল পিপুলের একরোখা দেহটাকে জড়িয়ে রঙ বেরঙের লতা। উপবনের আঁচলে যেন জরীর পাড়। রুপোলী জলের ধারা চলেছে নালা বেয়ে। বুড়ো অজগর যেন তার লম্বাটে দেহটা এলিয়ে শুয়ে আছে নির্জীবের মত। নালার ভিজে মাটিতে নিশানার হদিস করে কান্ধাই। হাণ্টার ও হারকিউলিসকে তাই এবার কাজে লাগানো হলো বটে তবে ওরা চতুষ্পদীদের পায়ের ছাপ পরীক্ষায় বিশেষ উৎসাহ দেখালনা বলেই কান্ধাইকেও ডেকে ফেরালুম।

হাণ্টার আর হারকিউলিসের কথাটা একটু না বললেই নয় এখানে। ওরা জাতে কুকুর তবে সগোত্রে ওরা নিকষ কুলীন। রাণাসাহেবের এই এ্যালশেসিয়ান জোড়ার তুলনা মেলা ভার—কি আকারে-প্রকারে, কি বলবুদ্ধিতে। নালা বরাবর পথটা চড়াই উৎরাই নিয়ে যেমন খাপছাড়া তেমনি কুসুমে আস্তীর্ণ নয় বরং কণ্টকে আকীর্ণ; আলুথালু পাথর বিন্যাসে সর্পিল আর হাঁ-করা অগুণতি গর্ত আর গহ্বরে চেহারটা বেজায় কুটিল। কান্ধাই এই মহাপ্রস্থানের পথটাই কিন্তু ধরলে শেষ পর্যন্ত। নালাটা কিছুদূরে একটা চড়াইয়ের বুক চিরে চলেছে দেখে আমাদেরও থমকে দাঁড়াতে হলো। চড়াইটা এমন কিছু দুরারোহ নয়। তবে একে তো জঙ্গলের গহনতা ওখানে কিছুটা বেশি; তার উপর চড়াই ভাঙতে

বা উতরাই নামতে হঠাৎ কোন মারমুখো জানোয়ারের সাথে অযাচিত মোলাকাৎ ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। আরোহণ বা অবরোহণ কালের প্রতিটি মুহূর্ত মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক—কেননা জানোয়ারের পক্ষে এমনি জায়গায় গা ঢাকা দিয়ে এগিয়ে আসা যেমন সহজ, মানুষের পক্ষেও তেমনি ওদের আকস্মিক আক্রমণে রুখে দাঁড়ানও একরকম অসম্ভব। সুতরাং নালার গা বেয়ে চলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। হাণ্টার এতে একটুও খুশি হয়নি। তবে হারকিউলিসকে বিনা প্রতিবাদে প্রভুর অনুগামী হতে দেখে তাকেও এগিয়ে আসতে হলো। আরও কিছুটা এগিয়ে একফালি জঙ্গলকে লেজের প্যাঁচে পাক দিয়ে নালাটা চলেছে ডাইনে। নালার গা থেকে একটা দুরন্ত খাদ বেরিয়ে চলেছে বাঁয়ের জঙ্গলে। খাদের বুকে গড়িয়ে চলেছে একটা জলের ধারা—জলের নিচে হাঁ করে আছে বড় বড় ফাটল। বনচারী চতুষ্পদীদের সাথে বনবিহারী দ্বিপদীদের অজস্র পদচিহ্ন আঁকা রয়েছে —আজও অক্ষত অনাহত।

খাদের ওপারের গাছেরা যেন মাথায় কিছুটা ছোট তবে বহরে তেমনি বড় বটে। ঝোপঝাড়গুলো শ্যামল সবুজ নয়। তামাটে বা ফিকে হলদে রঙের জৌলুষহীন চেহারা—একে অপরের সাথে যেন কুস্তি লড়ছে। গত সন্ধ্যের একটু আগেই জাওলা বৈগা আর কান্ধাই এসে বেঁধে রেখে গেছিল প্যাটেলের বুড়ো বলদটাকে। আজ সে বলদ হারিয়ে গেছে। হাণ্টার আর হারকিউলিস তাই খুনীর সন্ধান করে ফিরছে মাটির গন্ধ শুঁকে। কুকুর দুটো ঝোপের আড়ালে চলে গেল দেখে আমরাও হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে এগিয়ে চলেছি, হঠাৎ ওরা চাপা আওয়াজের কোলাহল তুলে ছুটে এলো। খুনীর সন্ধান এত সহজে মিলবেনা সেকথা আমরা জানি। কিন্তু খুনের পাত্তা না পেলে রাতের মাচান বাঁধবো কোথায়? ওরা সেই পাত্তা নিয়ে এসেছে। ঝোপের ভেতর বুড়ো বলদের দেহটা দেখে মনটাতে একটুও দুঃখ বোধ হয়নি এমন নয়। তবে চার না দিলে মহারাজের

মত অমন প্রতিদ্বন্দ্বীকে টেনে আনবো কিসের জোরে? মহারাজ টোপ গিলেছে ভেবে মনটা খুশির ঝলকে ভরে উঠলো। কান্ধাই কিন্তু মাথা নেড়ে বলে, 'এ কখ্খনো মহারাজ নয় হুজুর—কখ্খনো নয়।' বৈগার হিসেবে মহারাজ যখন বনান্তরে তখন এখানে সে আসবে কেমন করে। বলদের বুকের অংশটুকু শুধু আহার করে কি মহারাজের পেট ভরে! কান্ধাই আবার বলে, 'মহারাজ নয় হুজুর, তবে মহারাজের অনুচরবর্গের কেউ হবে নিশ্চয়ই।' মহারাজই হন, কিংবা তার স্বজাতি কেউ হোক—রাতে তো খুনীর দেখা মিলবেই। উপযুক্ত জায়গা বাছাই করে তাই গজ পঞ্চাশেক দূরের একটা গাছে মাচান বাঁধা হলো। শিকারটাকে একটু সরিয়ে এমনভাবে গুছিয়ে রাখা হলো যাতে মাচানে বসে চাঁদের আলোতে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাই খুনীকে। কুকুর ছুটো হঠাৎ দূরের জঙ্গলটাকে লক্ষ্য করে চেঁচামেচি শুরু করে। বৈগা আসছে আর ছুজনকে সঙ্গে নিয়ে। মাচান দেখে বৈগার মন উঠলোনা কিন্তু। তাই রাণাসাহেবের জন্যে আরও একটা মাচান তৈরি হলো নালার দিকের পথটার উপরে। বৈগাও বলদের সেই অর্ধভুক্ত দেহটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, 'ছোট শের হুজুর—বাঘ নয়, গুলবাঘ'।

এবার আমাদের ফেরার পালা—ফিরছিলুমও। হঠাৎ হাণ্টার গোঁ গোঁ শব্দ করে পাশের ঝোপটার মধ্যে লাফিয়ে পড়লো। বিদ্যুৎবেগে ঝোপটাকে বেড় দিয়ে ছুটে গেল হারকিউলিস। আমরাও সচকিত হয়ে যে যার হাতিয়ার বাগিয়ে ধরলুম। বেচারী ফেউ! বাঘের মত একজোড়া কুত্তার বেড়াজালে বন্দী হয়ে ভয়ে কাঠ। রাণাসাহেব ধমক দিয়ে ওদের না ফেরালে বেচারী ফেউ বুড়ো বলদের সঙ্গ লাভ করেছিল আর কি। আবার সেই আগেকার চড়াই। এবার কিন্তু চড়াই ডিঙিয়ে আসছিলুম আমরা। হঠাৎ যেন কুকুর ছুটো ক্ষেপে উঠলো একেবারে। ক্রুদ্ধ চীৎকার আর অবিরাম ছুটোছুটি শুরু করলো দেখে বৈগা যেন একটু ঘাবড়ে যায়।

'হুজুর'—বৈগা ফিসফিস করে বলে—'বাঘ নয় ঠিকই, ওটা গুলবাঘ। নইলে কুকুরের চোখে ধুলো দিয়ে এতক্ষণ গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারতো না। আর মজাটা দেখুন হুজুর! এতগুলো শিকারী মানুষ আর শিকারী কুকুর দেখেও ব্যাটা ভয়ে পালায়নি। বরং আমাদের নজরবন্দী রেখে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।'

বৈগার কথা খুবই ঠিক। কিন্তু এই অতি শিক্ষিত শত্রুটাকে সায়েস্তা করবার উপায় কি? বন ঘিরে ব্যূহ রচনা করে ওকে হাতিয়ারের ডগায় তাড়িয়ে নিয়ে আসতে পারি এত লোকজন পাচ্ছি কোথায় এক্ষুণি? বৈগা তাই যুক্তি ঠাওরায়। নিচের খাদটা যেখানে নালার সাথে এসে মিলেছে সেখানটার ঐ ত্রিভুজের মত কোণের সরু ফালিতে ওৎ পেতে থাকবো আমি। বাঁয়ের জঙ্গলের যাতায়াতের পথের উপর পাহারায় থাকবে বৈগা। রাণাসাহেব কান্ধাই আর কুকুর জোড়ার সাহায্যে শিকারকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবেন আমার মারণাস্ত্রের মুখে। প্ল্যানমত আগেভাগেই এসে সন্ধিস্থলে ওৎ পেতে বসি আমরা। খাদ পেরিয়ে এপারের একটা মস্ত ফাটলের হাঁ-এর মধ্যে ঢুকে বসলুম আমি। বেশ যুতসই জায়গাটা। খাদের ওপারে একশ গজ আন্দাজ দূরের একটা গাছের উপর চড়ে বসলো বৈগা। ওর হাতে বন্দুক নেই যে গুলি ছুঁড়ে বাঘ মারবে। তবে বাঘ যদি ওপথ দিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে তাহলে সে চেঁচামেচি করে বা শব্দ করে শিকারকে আমার দিকে ভিড়িয়ে দেবে। এখানে বসে বৈগাকে বেশ দেখতে পাচ্ছি আমি। চড়াইয়ের জঙ্গলটার অনেকখানি দূর পর্যন্ত এখন আমার চোখের সুমুখে বিস্তৃত।

কিন্তু কৈ, কুকুরগুলোর ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনতে পাচ্ছিনা কেন? বাইরে বেরিয়ে ব্যাপারটা বুঝে নিই না। হামাগুড়ি দিয়ে বেরুতে যাব মাথার উপরকার পাথরটার গায়ে মাথাটা বেশ জোরেই ঠুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কানে এলো বৈগার উন্মত্ত চীৎকার, 'গুলবাঘা

হুজুর, হুঁসিয়ার'। অভ্যেসমত হাতের বন্দুক বাগিয়ে ধরলুম বিত্যুৎবেগে। 'কিন্তু গুলবাঘ যে আমার মাথার উপরকার পাথরটার উপর দাঁড়িয়ে মুখ বাড়িয়ে আমাকে দাঁত খিঁচিয়ে উঠবে এমন কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আত্মরক্ষার তাগিদে চিৎপাত হয়ে পড়লুম, কিন্তু গুলিও ছুটলো এই মুহূর্তটিতে। তবে উপর থেকে কোন উত্তর এলোনা। না একটা কাতর আর্তনাদ, না একটু গোঙরানি, না তার পালিয়ে যাবার হুটোপুটি শব্দটুকুও। তবে কি সে নিঃশব্দে গা ঢাকা দিয়ে আমার অপেক্ষায় আছে?

রাণাসাহেব কিন্তু সবাইকে নিয়ে হাজির হয়ে গেলেন মিনিট কয়েকের মধ্যেই। হান্টার আর হারকিউলিস শুঁকে শুঁকে গুলবাঘের পলায়ন পথের নিশানা পেয়েছে বোধ হয়। এগিয়ে গিয়ে তাড়াকরা যাক আবার। বৈগা আমার হাত টেনে ধরে। এখন থাক। একটা মস্ত বড় ফাঁড়া কেটে গেছে হুজুর। আমি ওর গোটা চেহারার ছবি দেখেছি। বড় ভারি বাঘা হুজুর। বাঘের চাইতে অনেক বেশি কৌশলী এই গুলবাঘ, অনেক বেশি হিংস্র প্রতিহিংসাপরায়ণ। চিতার চাইতেও বোধ করি বেশি চতুর ওরা, বেশি নিঃশব্দ ওর চলাফেরা।

বৈগার মুখে বৃত্তান্ত জেনে তো রাণাসাহেবের চক্ষু স্থির। এই সর্বনেশে প্যান্থারটার পেছু নিয়ে লাভ নেই। সেই ব্যাটাই যে আমাদের পেছু নিয়েছে। বৈগা ঘাড় নাড়ে। —'এতক্ষণ সে পেছু নিয়েছিল সত্যি, তবে এবার সে পালিয়েছে হুজুর। আমারই গাছের তল দিয়ে সে পালিয়েছে। ব্যাটা বড্ড ঘাবড়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও আমি তাকে ফেরাতে পারিনি। জাওলা বৈগা অনেক দেখেছে হুজুর, কিন্তু আজ যা দেখলাম তা আর কখনও দেখিনি। মানুষকে এমনি হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে বাঘ হয়ত ছাড়ে কিন্তু গুলবাঘা ছাড়ে না। যখন সে হুজুরের মাথার উপরকার পাথরটার উপর দাঁড়িয়ে রাগে লেজের ঝাপটা দিয়ে উঠল তখন ওর বড় বড় হলদে গোল চোখ

হুটো থেকে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছিল। অথচ হুজুরের সাথে চোখাচোখি হবার পর ও যেন কেমন হয়ে গেল। গুলিটা ওর গায়ে লাগেনি বোধ হয়। আর লাগলেও বা! কাঁধের উপর বড় জোর ছড় কেটে বেরিয়ে গেছে। জাওলা বৈগা ওদের চাহনি চিনতে ভুল করেনা হুজুর। গুলবাঘের অমন ভয়ার্ত চোখ আমি দেখিনি। গুলি-খাওয়া তো বিশ-পঁচিশটাকেই এ বয়সে দেখেছি। দেও জানে হুজুরের চোখে কি যাদু আছে।'

বৈগার জঙ্গলের দেবতা কি জানেন সে কথা থাক। কিন্তু আমি তো জানি যাদু যদি কোথাও থাকে তো আছে ঐ বড় বড় হলদে চোখজোড়াতে। আমার চোখে নয়। আমার চোখের সঙ্গে তুলনা ঐ হিংস্র চোখজোড়ার? এ যেন সূর্যের সুমুখে প্রদীপের আলো। বাঘকে কিছুটা জানি বটে। কিন্তু প্যান্থারের. সাথে পরিচয় আমার তখনও তেমন ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি। অথচ এই দুরন্ত কৌশলী প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে প্রতিযোগিতায় একটুও কুঁকড়ে আসছে না তো আমার স্নায়ুগুলো। কান্ধাই কিন্তু হঠাৎ হেসে ওঠে, 'হুজুরের চোখের যাদু নয় বৈগা—এ সেই বুড়ির যাদু।' হ্যাঁ, সেই বুড়ি দেখি সাতসকালে হনহনিয়ে যাচ্ছে সাহেবের তাঁবুর দিকে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাচ্ছ মায়ি?' বুড়ি মিটমিট করে চায়, 'ব্যাটা আজ শিকারে বেরুবে কিনা তাই একবার দেখে আসতে যাচ্ছি।' 'মন্তর পড়ে বুড়ি হুজুরের দেহবন্ধন করে রেখেছে। দেওয়ের আশীর্বাদ পড়েছে হুজুরের মাথায়।'

কান্ধাইয়ের কথায় আচমকা মাথায় হাত দিয়ে দেখি। না-না, —মাথায় নয় তো। বুড়ির দেওয়া মাদুলীটা সত্যিই সঙ্গে এনেছি বুকপকেটে লুকিয়ে।

দিনের আলোতে যে কাজ অপূর্ণ রেখে গেছিলুম রাতের আঁধারে তাকে সম্পূর্ণ করবার আশায় গোধূলী লগ্নেই ফিরে এসেছি রাতের আস্তানায়। মাচানের একটিতে আমি আর জাওলা বৈগা, অপরটিতে

কান্ধাইকে সঙ্গে নিয়ে রাণাসাহেব। মুখোমুখি মাচানে বসে আমরা ওৎ পেতে থাকবো রাতের দীর্ঘ অলস প্রহরগুলোকে পাহারা দিয়ে। নিঝঝুম সন্ধ্যা নেমে এলো গাছের মাথায়। লম্বাটে ছায়াগুলো গুটি গুটি হেঁটে এলো গাছের তলায়। তারপর বনতলের অন্ধ আঁধিয়ার জমাট বেঁধে লেপেপুছে একাকার করে দিলে অরণ্য আর আসমানের ফারাকটুকু। চেয়ে চেয়ে দেখছি অমরাবতীর অবগুণ্ঠিতারা আকাশের স্বচ্ছ অঙিনাখানি নিকিয়ে তুলসীতলের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলে একটি দুটি করে। আকাশ আবার তার অগুণতি প্রবাল পান্নার আলো-ঝলসানো উত্তরীয়ের ঝকমকে ঝালর ঝুলিয়ে গাছের মাথায় নামিয়ে দিলে বোরখাপরা চাঁদ। পরিচয়ের প্রথম পর্ব পেরুতেই চাঁদের মাথার ঘোমটা খসে পড়ে। মনের ভেতরে উঁকি দেয় অরণ্য অবগুণ্ঠিতা। মনের আলোটা বনের আলোর মতই বাঁধভাঙা। অদূরের ঐ নালাটার বুকে ঝিকমিক করছে ওর স্বচ্ছ জলের ধারা। সাতনরী হার যেন বুকে ওর দুলিয়ে দিয়েছে আকাশের চাঁদ। ভয় পেয়ে চোখ বুজিয়ে বসি। মায়াবিনী আমাকে আলোর আলেয়ায় ভুলিয়ে কোথায় যে নিয়ে যাবে কে জানে!

'নিউ-নিউ'—আচমকা বার দুই চেঁচিয়ে আমাকে চমকে দিলে একটা ভবঘুরে ফেউ। নড়েচড়ে দেহটাকে একটু চাঙ্গা করে নিতেই মনটাও সজাগ হয়ে ওঠে। বড় একঘেয়ে এই ওৎ পেতে থাকা। কিন্তু উপায়ই বা কি। পাঁচখানা গাঁয়ের মানুষ মুখ চেয়ে আছে আমাদের। রাতেও তো ওদের ঘুম নেই চোখে। প্রহরে প্রহরে ওরা কাঁসি পেটায় আর গলা ফাটিয়ে চেঁচায়, 'জাগতে রহ ভেইয়া'। ওদের সেই হুঁসিয়ারী হঠাৎ যেন মনটাকে ধমক দিয়ে উঠল, 'জাগতে রহ'। অদূরের ঐ ঝোপটার গায়ে চোখ দুটোকে পেরেক ঠুকে আটকে রাখি। ঐ ঝোপটার মধ্যেই আছে খুনীর আহার—অর্ধভুক্ত শব। মহারাজ যদি নাও আসে, দিনের বেলায় দেখা সেই ঘুঘু প্যান্থারটি হয়তো আসবে। ঐ তো ঝোপের আড়ালে একটা

অস্পষ্ট ছায়া নড়ে উঠলো না! ও হরি! ঝাঁকড়া মাথা একটা গাছের ডাল বাতাসে দুলে উঠলো মাত্র। ওদিকে শুকনো পাতার উপর পায়ে চলার সরসর শব্দ হচ্ছে না? হ্যাঁ—হচ্ছেই তো। একজোড়া ফেউ ওদের গন্তব্য পথে চলেছে। ওটা—ওটা কিসের শব্দ? কিছু নয়, বনময়ূরীর পাখার ঝাপট। নালার ধারের ধূসর বালির উপর একটা লম্বা ছায়া জলের দিকে এগুচ্ছে না! হ্যাঁ, তবে ওটা অরণ্যের সহস্র আলেয়ার মায়া, আরণ্যকের উপস্থিতির ইঙ্গিত নয়। ঝোপের আড়ে কার চোখের আগুন জ্বলে উঠে আবার নিভে গেল? চোখের দীপ্তি নয়, পাথরের গায়ে আলোকরশ্মির প্রতিফলন শুধু। জোনাকী-জ্বলা বনেও বাঘের চোখের আগুন চিনতে ভুল করে না কেউ। ওর গোল গোল হিংস্র চোখজোড়ার অসহ্য আলোর ছটায় রূপকথার অজগরের মাথার মণিকেও হার মানাবে যে। অকারণে এমনি আসে উত্তেজনা। তার পর আশাভঙ্গের অবসাদ।

সন্ধ্যে গড়িয়ে চলে রাত দুপুরে। গতরাত্রে যে খুনী প্যাটেলের বুড়ো বলদটাকে খুন করে উদরপূর্তি করেছিল আগামী রাতের আহার সে ঐ ঝোপটার আবরণে সঞ্চয় করে রেখে গেছিল সযত্নে সন্তর্পণে। জন্মাবধি এই তো তার অভ্যাস। শিকারের ঘাড় মটকে তাকে সে টেনে নিয়ে আসে ঝোপঝাড় বা খাদের নিরালায়। আকণ্ঠ আহার সেরে বাকিটুকু লুকিয়ে রাখে পরের দিনের আহারের জন্যে। পরের দিনের সন্ধ্যে নাগাদ সে ঠিকই এসে হাজির হয় তার লুকিয়ে রাখা আহারের কাছে। তা বলে তার এই হাজির হওয়াটা নেমন্তন্ন বাড়ির ডিনার টেবিলে এসে হাজিরা ঘোষণার মত নয়। সে আসে নির্দিষ্ট ঝোপটার কাছাকাছি কোথাও। আত্মগোপন করে অপেক্ষা করে সেখানে অনেকক্ষণই। সন্ধানী দৃষ্টি মেলে সে গোটা পরিবেশটার একটা হিসেব মিলিয়ে দেখতে থাকে মনে মনে। গত রাত্রে ঠিক যেমনটি সে দেখে গেছিল আজ রাতে ঠিক তেমনি আছে তো সব কিছুই। আশপাশের গাছগুলোকে ঠিক

আগের দিনের মতই দেখাচ্ছে কিনা—ঝোপঝাড়গুলোর চেহারাটাতে সন্দেহ করবার কিছু আছে কিনা। সন্দেহ করাই ওদের স্বভাব। কোথাও যদি সন্দেহ করার মত কিছু ঘটে তাহলে সে সহজে আত্মপ্রকাশ করতে নারাজ। কিন্তু ভোরের আগে সে স্থান ত্যাগ করে প্রস্থানের কথাও চিন্তা করেনা। সব কিছু যদি তার স্বাভাবিক মনে হয় তবেই সে এগিয়ে আসে আহার শুরু করবে বলে।

পরিত্যক্ত শবটিকেও সে খুঁটিয়ে দেখে ভাল করে। গন্ধ শুঁকে শুঁকে যাচাই করে নেয়। মহারাজকে মারবার অন্য উপায় না পেয়ে চন্দপুরের শিকারীরা একবার মহারাজের অর্ধভুক্ত একটা শবের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। পরের প্রভাতে দেখা গেল মহারাজ এসেছিল তার আহারের কাছে ঠিকই, তবে আহার সে স্পর্শ করে নি। শবটাকে অগোছালো দেখলে ওর ভারি সন্দেহ হয়। আর তার আহারে কেউ ভাগ বসিয়েছে দেখলে রাগ হয় বটে তবে মনটা অনেকখানি নিঃসংশয় হয়।

আমাদের হিসেব মত এতক্ষণ তো খুনীর দর্শনলাভ হওয়া উচিত ছিল। কে জানে কে ঐ বলদটাকে উপলক্ষ করে বুড়ো মেরে খুনের দায়ে ধরা পড়বে। কিন্তু কেন সে আসছেনা এখনও! এই রাত দুপুরেও কি ক্ষিধের তাগিদ নেই ওর? কিংবা সে আর কোথাও একটা নোতুন শিকারের ঘাড় ভেঙেছে। তাই পুরানোর প্রতি আকর্ষণ নেই আর। দিনের বেলায় দেখা সেই প্যান্থারটাকেই মনে হয় আসল খুনী। বাঘের চাইতে গুলবাঘা আরও বেশি ফন্দীবাজ, আরও বেশি সন্দেহপরায়ণ। তাছাড়া দিনের বেলায় আমাদের সাথে ওর পরিচয়টাও তো খুব প্রীতিপ্রদ গোছের কিছু নয়। সে নিশ্চয়ই অনুমান করেছে চতুর মানুষ ফাঁদ পেতে আছে তার আহারের কাছে। কিংবা যখন সকালে মাচান বাঁধছিলুম আমরা তখন সে কাছাকাছি লুকিয়ে ছিল হয়তো। গা ঢাকা দিয়ে দেখেছে বসে সবই।
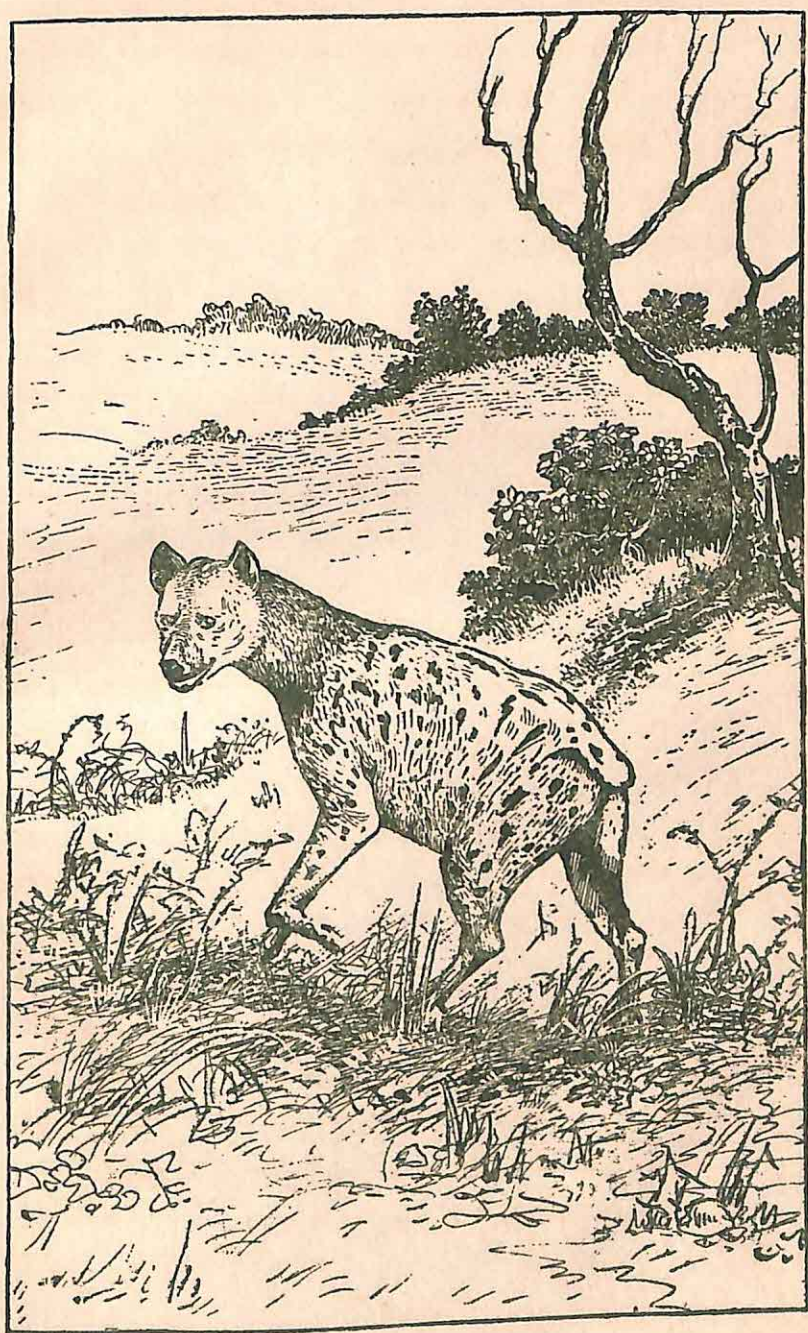
'নিউ নিউ'—চাঁদের আলেতে বেরিয়ে এলো নিঃসঙ্গ ফেউ। আবার ডাকে সে 'নিউ-নিউ'। সজাগ হয়ে ওঠে স্নায়ুগুলো। আমরা জানি অমন করে ফেউ ডাকছে কেন, ঘন ঘন জিভ চাটছে কেন, অমন পলকহীন চোখের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে কেন ঐ ঝোপটার দিকে। ফেউ জানে ভূরিভোজের আয়োজন আছে ঐ ঝোপটার গর্ভে। কিন্তু আসল মালিকও যে সশরীরে বর্তমান। তাই সে ঘন ঘন পাশের ঝোপটার দিকে তাকাচ্ছে, এগোতে সাহস পাচ্ছেনা আহারের দিকে। হ্যাঁ, ঐ তো আমরাও দেখতে পাচ্ছি। অস্পষ্ট ছায়াটা এখন যেন অনেকখানি স্পষ্ট। চারপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কোনো জানোয়ার। মুখের ছায়াটা যেন কুকুরের মুখের মত লম্বাটে।

কে ও এমন ভয়ে ভয়ে এগিয়ে আসছে চাঁদের আলোতে। চিনি ওকে—ওর ঐ নেংচে চলা দেখে চিনে ফেলেছি চোরকে। একটু চলে, একটু থামে, ঝোপটাকে কয়েকবার বেড় দিয়ে পরিক্রমা করে আসে। তারপর চোরের মত এদিক ওদিক তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে চলল সে তার আহার চুরির চেষ্টায়। শবের কাছে এসে কিন্তু থমকে দাঁড়াল আবার। আর একবার সে ঝোপটাকে বেড় দিয়ে ঘুরে এলো। কি জানি শবের মালিক যদি এসে পড়ে অতর্কিতে। তারপর শবের গা থেকে এক খাবল মাংস টেনে নিয়ে সে পালিয়ে এলো আমাদের গাছের তলে। এক নিঃশ্বাসে মাংসটুকু গলাধঃকরণ করে হাড়টাকে লুকিয়ে রেখে এলো ঝোপের আড়ালে। আবার সেই পরিক্রমা, আবার সেই এক খাবল মাংস নিয়ে পালিয়ে আসা।

ওদিকে সেই ভবঘুরে ফেউও একটু একটু করে এগিয়ে এসেছে বেশ কিছুটা। হায়েনা যখন ঝোপঝাড়গুলো খুঁটিয়ে দেখতে ব্যস্ত, সেই অবসরে সেও ছুটে এসে কয়েক খাবল মাংস আত্মসাৎ করলো। হায়েনাকে ফিরে আসতে দেখে সেও একটা যুতসই

মাংসখণ্ড মুখে নিয়ে সসম্ভ্রমে ওকে পথ ছেড়ে দিলে বটে। তবে হায়েনাকে সে বিশেষ ভয় করে এমন কোন লক্ষণই দেখা গেল না। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। দুই চোরের এই তামাসা দেখে হাসি চেপে রাখাই দায়।

ফেউ ফেউই। কিন্তু হায়েনা বা লক্কড় বাঘা! গুলবাঘের তুলনায় গায়ের জোরে সে বিশেষ কমতি যায়না। আর ওর চোয়ালে যে পরিমাণ শক্তি আছে তার তুলনা কোথায় পশুজগতে! এতখানি দৈহিক বল আর চাতুর্য নিয়ে অমন চোরের মত ওর বেঁচে থাকাটা কিছুতেই আমার বরদাস্ত হয় না। ওর গড়নে জৌলুষ নেই, ভঙ্গিমায় আভিজাত্য নেই, চালচলনে ছন্দ নেই। আর মুখখানি! সেখানে শ্রী ছাঁদের বালাই তো নেইই, বরং মৃত্যুর পরেও ওর কদাকার মুখখানি একটি জীবন্ত বিভীষিকা। হায়েনার শবের উপর শকুনি ঝাপিয়ে পড়ছে না অথচ মাংসের লোভে শকুনিকুল শবের চারিপাশে ভীড় করে আছে। শবের দেহ থেকে মুণ্ডটা আলাদা করে সরিয়ে নিলে তবেই শকুনি ওর মাংস টেনে ছিঁড়বে। এই তো গেল ওর মুখশ্রীর কথা!

কিন্তু ওর ঐ চেহারা-ছবিটা তো বিধাতার দান। ওর দোষ নেই। ওর ঐ ভীতু স্বভাবটাই ওকে চোর বানিয়েছে। একটা মেঠো ন্যাংড়া কুকুরও রুখে দাঁড়ালে লক্কড় বাঘা উভরড়ে পালাবে। একটা সদ্য শিং গজানো বাছুর রুখে দাঁড়াতেই হায়েনা পিছু হঠবে। একটা রামছাগলকেও সে সুমুখে দাঁড়িয়ে আক্রমণ করতে সাহস পায়না। তাইতো ওর উপর আমার এই হাড়ে চটা ভাব।

আজ কিন্তু ওকে খুব ভাল লাগছিল। ওর হাবভাবের হিসেব করে নির্ভুল নিশানা পাচ্ছি আমরা। আসল খুনীর আগমনবার্তা বা অবস্থিতি সম্পর্কে হুঁসিয়ারী দেবে সে। ওদিকে বলদের শব ক্রমেই তো কমে আসছে আকারে ওজনে।

কেউ তো গুরুভোজে তৃপ্ত হয়ে বিদায় নিয়েছে এইমাত্র। লক্কড়-বাঘাও তো হাতপা ছড়িয়ে উদরপূর্তির চাইতে চোয়ালের ব্যায়াম করতেই ব্যস্ত। রাত্রিও ফুরিয়ে আসছে। ভাবছিলুম খালি হাতে ফিরে যাবার চাইতে এই কুৎসিত চেহারার জানোয়ারটাকে বলদের সঙ্গী করে পাঠাই কিনা।

হঠাৎ সে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল কেন? আমার এই নিভৃত চিন্তাটার কথা ওর কানে গিয়ে পৌঁছালো নাকি! মুখের হাড়খানা মাটিতে পড়ে গেল, তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই। রাণাসাহেবের মাচানের দিকটাতে অপলক চোখে তাকিয়ে কি দেখছে সে। মুহূর্ত মধ্যেই নেউটে পালিয়ে গেল লক্কড় বাঘ। সত্যিই তবে এবার আসছে বৃহত্তর মহত্তর কেউ—বাঘা না হোক গুলবাঘ অন্তত। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পরম বাঞ্ছিত মুহূর্তটি। কিন্তু কই আর কোন সাড়া নেই কেন?

হঠাৎ বৈগা দুই ঝোপের মাঝখানটাতে আঙুল দেখিয়ে আমাকে নিশানা দেয়। আগাছাগুলোর আড়াল দিয়ে গুঁড়ি মেরে দূরের ঝোপটাতে যাচ্ছিল সে। চাঁদের আলোতেও চমৎকারভাবে আত্মগোপন করে চলেছিল এবং জাওলা বৈগা সঙ্গে না থাকলে আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারতো সে অনায়াসে। ঘাড়ের উপর একজোড়া গুলি একসঙ্গে বিঁধতেই সে একটা পাক খেয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

সকালবেলা যারা মহারাজের মৃতদেহ দেখবে ভেবে দল বেঁধে এসেছিল তারা কিন্তু মহারাজের পরিবর্তে এই গুলবাঘাকে দেখে একটুও দুঃখিত হয়নি। গতরাত্রে যখন আমরা মাচানে বসে ওরই আগমনের প্রতীক্ষা করছিলুম তখন সে আমাদেরই তাঁবুতে হানা দিয়েছিল দু-দুটো বন্দুকের প্রহরাকে এড়িয়ে। শুধু হাণ্টার আর হারকিউলিসের চোখ এড়াতে পারেনি বলেই শেষ পর্যন্ত তাঁবুর পাশের এক চাষী গেরস্তের গোয়াল থেকে একটা বাছুরকে সে চুরি করে নিলে। কি জানি আহার শেষ করে সে গত রাতের সঞ্চিত

খাবারের তদারক করতে এসেছিল, না নিয়তি তাকে টেনে নিয়ে এলো চিত্রগুপ্তের হিসাবের গরমিল বাঁচাতে।

সাত সকালেই সাজগোজ শুরু হয়েছে—আজ আমার বিদায়ের পালা। না গেলেই নয়। কান্ধাই তার একনলা গাদা বন্দুকটাকে বগলে চেপে ঘন ঘন তাগিদ দিচ্ছে গাড়িতে উঠে। আমাকে রেলস্টেশনে পৌঁছে দিয়ে সূর্যাস্তের আগে ওদের আবার ফিরে আসতে হবে। বলদ দুটো তাদের গলায় বাঁধা ঘণ্টায় মিষ্টি সুর বাজিয়ে এই বিদায় পর্বের শেষ বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করল। মেঠো পথ—এই পথ দিয়েই এক হপ্তা আগে এসেছি। তবে বলতে লজ্জা নেই সেদিন এসেছিলুম চোরের মত। সেকথা ভাবতেই আজ হাসি চাপতে পারলুম না। উঃ! সে কি অসহনীয় অবস্থা!

সুমুখে ছিল একটা প্রশস্ত নালা। গাড়িটা সবে নালার মধ্যে নামতে যাবে এমন সময় অকস্মাৎ গড়ির বলদ দুটো লম্ফঝম্ফ দিয়ে গাড়িটাকে অতর্কিতে উলটে দিলে নালার মধ্যে। পুচ্ছ উঁচিয়ে ভয়ার্ত হাম্বা রবে দড়ি ছিঁড়ে ছুটে পালাবার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠল যেন। একে তো চোট লেগেছে কিছু কম নয়। তারপরে জগদ্দল পাথরের মত যেন বুকের উপর পাষাণভার নিয়ে চেপে বসেছে গাড়োয়ান ব্যাটা। সে তার দেহের সবখানি শক্তি দিয়ে আঁকড়ে আছে আমাকে আর ভয়বিকৃত কণ্ঠে অদ্ভুত আওয়াজ করছে, 'মহারাজ! সাহেব! মহারাজ!' মহারাজের কথা তো সেদিন সকাল থেকেই শুনছি শুধু। কিন্তু এই অঘটনের কারণ সেই মহারাজ একথা ভাবতেই হৃৎপিণ্ডটাও বেশ জোরেই যেন দুলে উঠল বার কয়েক।

বিপদে বুদ্ধির অন্তর্ধানটাই শুধু সত্যি নয় তার আবির্ভাবটাও তেমনি সত্যি। গাড়োয়ানের প্রেম আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে ওর গর্দানের উপর বসিয়ে দিলুম ঘা কয়েক জবরদস্ত ঘুসি। নিজের জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে ম্যাচ বাকসো বার করতে গিয়ে দেখি হাতটাও কাঁপছে হৃৎপিণ্ডের সাথে সমান তাল রেখে।

গাড়ির ভেতরে আমার আসনের নিচে বিছানো ছিল অগুণতি খড়ের আঁটি। আগুন ধরিয়ে দিলুম তাদের গোটা কয়েক একজায়গায় জড়ো করে। দাউ দাউ করে ওরা জ্বলে উঠতেই বুকের ভেতরকার নিভন্ত আগুনটাকেও কে যেন উসকে দিলে। জ্বলন্ত খড়ের আঁটি হাতে করে ওলটানো ছইয়ের ভেতর থেকে গুঁড়ি মেরে বাইরে এলুম।

কৈ, মহারাজের দর্শন মিলবার কোন লক্ষণই তো নেই। কিছু দূরে অবিশ্যি কতকগুলো ঝোপঝাড় দেখা যাচ্ছে। এতক্ষণে নজর পড়েছে নিজের দিকে। নালার কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে নিজের চেহারা-ছবিটা এমন বদলে নিয়েছি যে ভস্মভূষণধারী ভোলানাথও পাল্লা দিতে পারতেন না আমার সঙ্গে। চাই কি, স্বয়ং মহারাজের পক্ষেও আমাকে মানুষ বলে চেনা সহজ হতোনা। বলদজোড়ার একটিও যে খোয়া যায়নি এতেই আশ্বস্ত হলুম অনেকখানি। ওরাও ওদের মালিক এবং আরোহীকে অক্ষত দেখে খুশি হয়েছিল নিশ্চয়। ওদের ভয়-বিস্ফারিত চক্ষু তখন কিছুটা সংকুচিত হয়েছে বটে তবে নিরাপত্তার ভাব সেখানে নেই। এর পরে এই মেঠোপথের বাকি মাইল কয়েক গোরু ছুটো প্রাণপণে ছুটেছে। খড়ের আঁটির আগুন একসময় শেষ হতে চলেছে দেখে গাড়ির রঙচঙে ছইটাকে নির্বিচারে ইন্ধন হিসেবে সঁপে দিতে হলো।

সেদিন আমার স্থির বিশ্বাস হয়েছিল, আর যে হয় হোক, 'মহারাজ' সে কক্ষণো নয়। আজও তেমনি মনের ভেতর কেন জানিনা এই ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে ছিল যে মহারাজ মরেনি—তা গাঁ শুদ্ধু লোক যতই বলুক না কেন সেকথা। মালাপুর-দেওপুরা ইত্যাদি দশখানা গাঁয়ে আজ যদি একজনও বাল্মীকি থাকতেন তাহলে মহারাজের প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি দিব্যি একখানা 'মহারাজায়ণ' লিখে যেতে পারতেন। এ হেন মহারাজের এমন অবহেলিত মৃত্যু কল্পনা করলে যে নিজের মনটাও অস্বস্তিতে ভরে ওঠে। বৈগার হিসেবমত গত পরশু ছিল মহারাজের শুভাগমনের কথা। পাছে

জঙ্গল দেও মায়াবশে তাঁর বাহনটিকে অন্যত্র প্রেরণ করেন এই আশঙ্কায় তাঁর উপযুক্ত ভেট পাঠাতেও ত্রুটি করিনি আমরা।

রাণাসাহেব এসব ব্যাপারে কিছুটা নাস্তিক। তবুও বৈগার ফরমাস মত গৌরীসেনী মেজাজে টাকা জুগিয়েছেন তিনি। একমাত্র উদ্দেশ্য মহারাজের আগমনকে অনিবার্য করে তোলা। নইলে আর কতদিনই বা এমনি করে মহারাজের আশায় দিন গুণবো! একজোড়া মিশমিশে কালো ছাগনন্দন, একজোড়া পাঁচরঙা পালকের মোরগ আর এক বোতল পচাই মদ একটিমাত্র ঝুনো নারকেলের জলে নিকিয়ে জঙ্গল দেওয়ের পূজার নৈবেদ্য সাজিয়ে দিয়েছে বৈগা। যথাশাস্ত্র মন্ত্রাদিও উচ্চারিত হয়েছে। রাত্রে মহারাজের আহারটা যাতে বেশ রাজসিক গোছের হয় সেজন্যে একটা জোয়ান মহিষকেও তাঁর সম্ভাব্য আগমনের স্থানে বেঁধে রাখা হয়েছিল। কোনদিকে কোন্ ত্রুটি ছিলনা। তবুও মহারাজ আসেননি। পর পর তিন দিন পেরিয়ে গেছে। গাঁয়ের মানুষের ধ্রুব বিশ্বাস বৈগার হিসেবে ভুল হতে পারে না। অতএব মহারাজের মৃত্যু উপলক্ষ করে তারা গতরাত্রে নাচগান হৈহুল্লোড় করতেও কসুর করেনি।

মহারাজকে ভয় করিনা এমন কথা হলপ করে বলবোনা। একটিবার মহারাজের দর্শনলাভের জন্যে কি মূল্য দিতে হবে কে জানে। হয়তো এই দূরদেশের এক অখ্যাত গাঁয়ে চোরের মত অপমৃত্যু এসে গলা টিপে ধরবে। এ যেন সাধ করে ফাঁসীর দড়ির সাথে গলার পেশীর শক্তি পরীক্ষা করা। তবু যেন মহারাজকে দর্শন না করে ফিরে যেতে মন চাইছেনা। অথচ রাণাসাহেবের তার পেয়ে যেদিন চণ্ডীগড় থেকে যাত্রা করেছিলুম সেদিন মালাপুরের নামও শুনিনি—তার মহামহিম মহারাজেরও বিন্দু বিসর্গ জানা ছিলনা। মিত্রকেই মানুষ ভালবাসে? কিন্তু শত্রুকেও যে মানুষ এমনি জপমালার মত জপ করে সেকথা এর আগে বুঝিনি। মহারাজ কি সত্যই মরেছে? বৈগা তো সেকথা মুখফুটে বলেনি।

রাণাসাহেবও বিশ্বাস করেননি নিশ্চয়। তাহলে আসবার সময় কান্ধাইয়ের হাতে বন্দুক থাকা সত্ত্বেও জোর করে এই দোনলাটা সঙ্গে দিলেন কেন ?

যাকগে ওসব কথা। দেহখানিকে এলিয়ে দিতে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে মাথাটা বেশ জোরেই ঠুকে গেল ছইয়ের সঙ্গে। গাড়ির গতিও স্তব্ধ। ব্যাপার কি! বলদজোড়া গাড়ি সমেত পিছু হটতে রাজী কিন্তু সুমুখে এগুতে একেবারেই নারাজ। কান্ধাই এর কারণ জানে। তাই সে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে অদূরের ঐ উঁচু টিলার গায়ের ঝোপটার দিকে। তাকিয়ে দেখি সারমেয় দম্পতি দাঁড়িয়ে আছে নির্বিকার। গাড়োয়ানের গলায় ভয়ের আমেজ—সোনা এসেছে। সে দিব্যি গাড়িটাকে আবার মালাপুরের দিকে ঘুরিয়ে দিলে। কান্ধাই ওকে ধমক দিয়ে কুকুর দুটোকে গুলি করবার কথা পাড়ে। ঝোঁকের মাথায় কয়েক পা এগিয়েছিলুমও বটে। কিন্তু মনটা হঠাৎ যেন দমে গেল। পুরুষ কুকুরটি তার প্রণয়িনীর ঘাড়ের উপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

দৃশ্যটা ভালো লাগবারই মত। আর তাছাড়া বাল্মীকির সেই ক্রুদ্ধ অভিশাপটা যে আজও আকাশে বাতাসে সুর ছড়িয়ে সকল যুগের ঘাতকদেরই তো হুঁসিয়ারী জানাচ্ছে। কান্ধাই কিন্তু খুশি হলোনা আমার প্রস্তাবে। এদেরকে না মারলে গাড়িও এগুবেনা এক পা। ফাঁকা আওয়াজ করতে দোষ কি? ফাঁকা আওয়াজ শুনেও সারমেয় যুগলের বিশেষ কোন ভাব পরিবর্তন ঘটলোনা। কুকুরী যদিও বা অস্ফুট 'ঘউ' শব্দ করলে একবার, কুকুরটির গলা থেকে বিরক্তির একটা ক্ষুদ্র গোঙরানি ছাড়া আর কিছুই কানে এলোনা। কিন্তু গুলির প্রতিবাদ এলো দূরের এক ঘোড়সওয়ারের কাছ থেকে। অচিরেই প্যাটেলের বেতো ঘোড়াটাকে বেতের জোরে ছুটিয়ে এসে হাজির হলো বৈগা।

'সাহেব ফিরে যেতে হবে তোমাকে—যেতেই হবে—আর এক্ষুণি।'

বৈগার অনুরোধ গ্রাহ্য করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কেননা বলদজোড়াকে বাগ মানানো সাধ্যে কুলোয় কৈ। মাঝপথেই দেখি রাণাসাহেব দলবল নিয়ে আগুয়ান। চিতার দল বন ছেড়ে গাঁয়ের আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে দিন দুপুরে—এমন অলক্ষুণে দিনে কি পথে বেরুতে আছে? একপাল বারশিঙা ছুটতে ছুটতে গাঁয়ের গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে—যেন এক ঝাঁক তীর। বাঘের ভয়ে বারশিঙা কেন শিংবিহীন কোন অরণ্যচারীও তার অরণ্য-আস্তানা ছাড়েনা। তবে? ঐ তো বনবোরগের দল গাছের উঁচু ডালে চড়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। ঐ যে কাঠঠোকরা কাঠের ছাল ওঠা গুঁড়িতে বসে একটানা ঢ্যাড়া পিটিয়ে চলেছে 'সোনা এসেছে সরে পড়'। সত্যিই বোধ হয় সবাই সরে পড়েছে। বন এমনি নিঝঝুম।

কিন্তু কোথাও সেই জংলী কুত্তার দল। তাদেরও কোন সাড়া নেই কেন? ওদের একজোড়াকে তো সকালেই দেখেছি। কিন্তু কৈ, তেমন মারমুখো বলে মনে হয়নি তো।

চলতে চলতে অনেকখানি এসে পড়েছি বনের গহনে। সুমুখেই একটা খাল—এক বুক জল চিক্‌চিক্ করছে খালের বুকে। এপারে জঙ্গল যেমন ঘন ওপারে তেমনি হালকা। বেশ যুতসই জায়গা বটে। দুপারে দুটি মাচান বেঁধে রাত্রিটা মাচানে বসেই কাটিয়ে দেওয়া যাবে। অনেক রাত্রিই তো অকারণে কাটিয়েছি একটি রাত বৈ তো নয়। এখনও বেলা আছে অনেক। সন্ধ্যের আগেই মাচানে চড়ে বসলে হবে। এখন কিছু জলপান করা যাক।

মুখের খাবার মুখেই রয়ে গেল। হঠাৎ একটা হুটোপুটি শুনে হাতিয়ার নিয়ে লাফিয়ে উঠলুম। তিড়িং-তিড়িং-তিড়িং—একপাল সম্বর-সম্বরী ওপারের বনটার মধ্যে চকিতে মিলিয়ে গেল। একটা হায়েনা ছুটে এল কোত্থেকে। বার দুই তার মড়াকান্নার আওয়াজে কি একটা অলুক্ষুণে ইঙ্গিত জানিয়ে নেউটে পালালো। এরপরে

গাছে চড়ে বসাই যুক্তিযুক্ত। আবার সেই হুটোপুটি। ডাইনে বাঁয়ে হুদিক থেকেই ছুটে এলো সম্বর আর বারশিঙাদের ক'টি ছোট দল। দিশেহারা হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে ওরা। এতক্ষণে বোঝা গেল সোনার অভিযান শুরু হয়েছে।

ওরা চোখের বাইরে চলে গেল তো এসে পড়লো একটি দলছাড়া নিঃসঙ্গ সম্বর। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। নেউটে বাঁদিকে ছুটতে চাইল বটে। কিন্তু রেহাই নেই সেদিকেও। সপ্তরথীর চক্রব্যূহে নির্গমনের ছিদ্র নেই কোথাও। সুমুখে আশেপাশে এক বিহ্যৎগতি বিভীষিকা। ঝড়ের বেগে ঝোপঝাড়গুলোকে ডিঙিয়ে উঁচুনিচু অবলীলাক্রমে মথিত করে আসছে ওরা—শোনা যাচ্ছে ওদের অস্ফুট একটানা 'ঘউ-ঘউ'। বেচারী সম্বর বেড়াজালে বন্দী হয়ে বিভ্রান্তের মত ছুটে এলো আমাদেরই গাছের তলে। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে ধুঁকছে সে—জোরে জোরে নিশ্বাস টানছে—নাভিশ্বাস প্রায়। মুখের হুপাশ বেয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে।

গাছের গুঁড়ি বেয়ে সরসর শব্দে নামলো একটা কাঠবিড়ালী। একেবারে সম্বরের মুখোমুখি এসে থামলো সে। লেজ উঁচিয়ে মাথা নাড়িয়ে বলে, 'জাঙ্ক, পালাও পালাও—সোনা তার দলবল নিয়ে এসে পড়লো যে'। সম্বর মুখ তুলে চেয়ে দেখে তার ছোট্ট বন্ধুটিকে—করুণ হুটি কাজল চোখে ঘনিয়ে এসেছে মৃত্যুর কালো ছায়া। সম্বর তার মুখের হুপাশ বেয়ে গড়িয়ে পড়া ফেনা গাছের গুঁড়িতে মুছে নিয়ে জবাব দেয়, 'পালাবার পথ নেই বাকরা'।

'আছে—আছে'—মাথা উঁচিয়ে বললে একটা খরগোস—'বোকার মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকোনা জাঙ্ক। সুমুখ বরাবর ছুটে যাও। ঐ তো দেখা যাচ্ছে সুমুখে একবুক জলভরা একটা খাল। ঝাঁপিয়ে পড়ো ঐ খালের জলে। অন্তত বেশ কিছুক্ষণ আত্মরক্ষা করা সম্ভব হবে। এস, এস—এই তো পথ।' খরগোস সম্বরকে

খালের পথে এগিয়ে দিয়ে ডুব দিলে তার গর্তের মধ্যে—ওর পাতালপুরীর প্রাসাদের উদ্দেশে। হাজার দুয়ারী প্রাসাদ ওর।

'ঘউ-ঘউ-ঘউ'—পলকপাতে এসে হাজির হলো জংলী কুত্তার দল। ছুটে গেল যেন একটা উল্কাপাত। সম্বর খালের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল দেখে ওরা খালের উঁচু পাড়টাতে দাঁড়িয়ে কোলাহল শুরু করে দিল। দলপতি একটা একটানা ঘউ শব্দ করতেই ওপার থেকেও জবাব এলো তক্ষুণি। দেখা গেল ওদের একজোড়া ওপারে দাঁড়িয়ে সম্বরের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। নিরুপায় সম্বর নজরবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মাঝ বরাবর একগলা জলে।

সম্বরের জন্যে করুণা হয়। দলছাড়া আজ সে একাকী। কন্তু ওর ঐ রাজসিক চেহারাখানি আর ঐ উদ্ধত শিংজোড়াই তো পরিচয় দিচ্ছে একদিন ওর সাম্রাজ্য ছিল, সিংহাসন ছিল ; বেগম, বাঁদী, অমাত্য পরিজনে দলটি বেশ ভারী ছিল। একবার ভাবলুম ওপারের ঐ খুনী দুটোকে খুন করলেই তো সম্বরের পলায়নের পথ পরিষ্কার হয়। কিন্তু কেন এই পক্ষপাতিত্ব!

এই যে সোনা আর তার দলবল! ওদের অমন রূপ নেই দেহে, অমন স্বপ্নালু চোখ নেই, সত্যি। না থাক। যা ওদের আছে বিধাতার সৃষ্টিতে তাই বা আর কজনার আছে—এই দুর্জয় গতি, এমনি হালকা অথচ এমনি লৌহদৃঢ় গঠন, এমনি কর্মঠ ভঙ্গি, দুঃসহ জিদ, এমনি একযোগে কাজ করার প্রবৃত্তি। বাঘের ভয় আছে, ভালুকেরও। নির্ভয়ে যদি কেউ বনে ঘুরে বেড়াবার সাহস এবং শক্তি রাখে তো সে এরাই। এই তো চোখের উপর দেখলুম অর্ধচন্দ্র ব্যূহ কেমন সুশৃঙ্খলায় গুটিয়ে এনে সাঁড়াশীর অব্যর্থ বেষ্টনী সৃষ্টি করল ওরা। পাছে খাল পেরিয়ে শিকার পালায় তাইতো আগে থেকেই ওপারে পাঠিয়েছে ওরা ছোট্ট একটি টহলদারী বাহিনী।

মানুষের দুনিয়ায় একটা চেঙ্গিস খান, একজন নাদিরশাহ,

একজন হিটলার বা একপাল হুণ এর চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করেছে। ইতিহাসের লেখায় মানুষের সভ্যতার উপর সে একটা মস্ত অভিশাপ—অনেক বেশি অকারণ, অনেক বেশি নির্মম। আর হত্যা! মানুষের হত্যার কি পরিমাপ আছে? এদের হত্যা তো নিতান্তই পরিমিত, নিতান্তই পেটের তাগিদে। ওপারের দুটিকে নিয়ে চোখের উপর দেখছি গুণতিতে ওরা দশজন। দশের জন্য একটিমাত্র বলি। মানুষী সভ্যতায় এ তো হামেশাই চলছে।

হিটলার কোন দিন এমনি গাছের ডালে মাচান বেঁধে বনকুকুরের শিকার ধরবার কৌশল দেখেছিলেন কিনা কিজানি। তবে তাঁর 'ঝটিকা বাহিনী' 'ব্লিৎসক্রীগ' আর সাঁড়াশি ব্যূহ রচনা করে শত্রুকে ঘায়েল করবার কৌশলটা কিছু নতুন নয়—একথা বললে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু আমার মত অলস চিন্তার সময় তো ওদের নেই। ওরা কাজের লোক। গায়ে কুৎসিত কিছু মাখলে কি যম ছাড়ে? জলে নামলেও কি জংলী কুত্তার হাত থেকে রেহাই আছে? এপার থেকে একজোড়া এক্ষুণি ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। সঙ্গে সঙ্গে ওপারের জোড়াটিও।

বেচারা শিকার! মরণের আশঙ্কার মধ্যেও তার মনে বোধ হয় উঁকি দিচ্ছিল জীবনের একটা ক্ষীণ আশা। জল যে জীবন। এই ক'মিনিট জলে গা ডুবিয়ে ক্লান্তি কমেছে বেশ কিছুটা, শ্রান্ত দেহে ফিরে এসেছে হারানো বল। কিন্তু এই জংলী কুত্তাদের সে তো হাড়ে হাড়ে চেনে। তাই দুপাশ থেকে দুজোড়া শত্রুকে সাঁতার দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে ব্যাকুল হয়ে উঠলো সে। কুকুরগুলো ওকে বেড়াজালে বন্দী করে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবে ওর ঐ নধর দেহটাকে। কথাটা ভাবতেই মনটা যেন বিগড়ে গেল—একটা অজানা অসহ্য অস্বস্তি। তাড়াতাড়ি বন্দুক তুলে নিয়ে লক্ষ্য করলুম ওপারের ঐ জোড়াটিকে। ওদের গতি স্তব্ধ হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। সুযোগ বুঝে সত্বর সাঁতার দিয়ে চললো

ওপারে। ডাঙ্গায় পা দিতেই ঝোপের আড়াল থেকে সাড়া দিলে ওর শেয়াল বন্ধু—'হুক্কা হুয়া হুয়া'। এগিয়ে এসে শেয়াল মশায় কিছু বললেন হয়তো ওর বিপন্ন বন্ধুটিকে। সম্বর মিলিয়ে গেল মেঘের কোলে একপলকে দেখা বিদ্যুতের রেখার মত।

চেয়ে দেখি সোনাও তার দলবল নিয়ে উধাও। গুলির ভয়ে ওরা পালায়নি। পলাতক শিকারের পেছনে তাড়া করে চলেছে। খালের ওপারে উঠে গা ঝাড়া দিয়ে গায়ের জল ঝরিয়ে নিলো। ঘউ ঘউ করে সবাই মিলে একটা কোলাহল তুলে বোধ হয় নিজেদের মধ্যে আক্রমণের সম্পর্কে একটা বোঝাপড়া করে নিলে। তারপর দে ছুট।

শেয়াল বন্ধুকে আবার দেখা গেল ওপারে। সম্ভবতঃ এই জংলী কুত্তাদেরকে অভিশাপ দিলে সে। বার কয়েক মুখ তুলে ওদের যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো। তারপর তুলকি চালে নেমে এলো জলের ধারে কয়েক চুমুক পানের জন্যে। বৈগা হাসে, 'ভয়ে এতক্ষণ ব্যাটার গলা কাঠ হয়ে ছিল। একটু গলা ভিজিয়ে নিচ্ছে তাই।'

আমার কথার জবাবে বৈগা আবার হাসে, 'গিডারের চালটা দেখে বুঝলেন না যে সম্বর এ যাত্রাটা প্রাণে বেঁচে গেল।' রাণাসাহেব অবাক হয়ে যান আমারই মত। দুজনে সমস্বরেই জিজ্ঞাসা করি বৈগাকে, 'এই নির্মম নাছোড়বান্দা শিকারীর কবল থেকে রেহাই কি সম্ভব?'

বৈগা বুঝিয়ে বলে, 'গিডার যে সম্বরকে ওর পুরানো দলের নিশানা বলে দিলে। চেয়ে দেখলেন না, সম্বর শিয়ালের নির্দেশমত আগের পথ বদলে অন্য পথে ছুটলো। ওর দলের মধ্যে একবার ভিড়ে পড়তে পারলে কুত্তারা আর ওকে চিনতে পারবে না। তবে সোনার সন্ধান–সে তো ব্যর্থ হবার নয়। তাই বলি একটা পড়বেই। ওর বদলে আর কেউ দলের—ঠিক অমন আর একখানি মাংসল বপু।' বৈগা আপন মনে হাসতে থাকে।

এমনি আনন্দ উত্তেজনায় অনেকক্ষণই তো কাটলো, অথচ সন্ধ্যে হবার নামটি নেই। মন্দার মন্থনের পর মহাসমুদ্রের মতই অতলান্ত অরণ্যগর্ভ যেন অস্বাভাবিক রকমের শান্ত। সোনার অভিযানের পরে আর শিকারের আশা করা চলে না। তাঁবুতে ফিরে গেলেও হয়। বৈগা আমতা আমতা করে—হয়তো তাই। সারা রাতে হয়তো একটা গিরগিটির সন্ধানও মিলবে না এই বনভূমিতে। আবার তার উলটোটাও ঘটতে পারে। আশপাশে যারা এতক্ষণ গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছিল এবার তারা আলোতে আসবে। সোনার পরিত্যক্ত স্থান রাতের আস্তানা হিসেবে অনেকটা নিরাপদ। সোনা আর তার দলবল এতক্ষণে হয়তো পৌঁছে গেছে দু'কোশ দূরে। ওখান থেকে তাড়া খেয়ে দিশেহারার দল ছুটে আসতে পারে এদিকেও। তা ছাড়া তৃষ্ণার তাগিদ আছে। এ অঞ্চলে জলাধার আর নেই অন্তত মাইলটাক ব্যাসের বৃত্ত মধ্যে।

বৈগার মুখের কথা না ফুরোতেই কোন এক অদেখা আড়াল থেকে টিকটিকি ডেকে ওঠে, 'টিক্ টিক্ টিক্'। কান্ধাই লাফিয়ে উঠে বলে, 'টিকটিকি-বেরস্পতির আজ্ঞা, এখানে আমাদের থাকাটাই তাহলে ঠিক।'

চায়ের ফ্লাস্ক তো এদিকে ঢালতে ঢালতে শূন্য হয়ে গেল, খেতে খেতে টিফিন ক্যারিয়ারের বাটিগুলোও। চাঁদ উঠবে মাঝ রাতে কিংবা তারপরে। তাঁবু থেকে খাবার আনাবার কোন উপায়ই নেই। কতদূর এসে পড়েছি তারও ঠিকানা জানা নেই। যাক, একটা রাত বৈ তো নয়। বরং একটু গড়িয়ে নিই। রাত্রে মাচানে বসে পিঠে কোমরে ব্যথা ধরবে। তার উপরে পেটের ক্ষিধে তো আছেই। কিছুটা দূরে গাছের একটা ভেঙে পড়া ডাল। ওর উপর তো স্বচ্ছন্দে গড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। আমাকে গা এলিয়ে দিতে দেখে রাণাসাহেবও লম্বা হয়ে পড়লেন মাটিতে। কান্ধাই কিন্তু কান খাড়া করে তখন শুনছে কার ডাক। হ্যাঁ,

ঠিকই তো মানুষের গলার একটানা আওয়াজ। বনের গভীরে হারানো বন্ধুকে এত্তেলা পাঠাবার এই হচ্ছে একমাত্র উপায়। কান্ধাই ঐ গলা চেনে। তাই সে জবাব পাঠায় তক্ষুণি। ছায়াছবির টার্জনের মত কান্ধাইয়ের গলা থেকে বেশ মিঠে আওয়াজ বেরুল বটে, তবে আচমকা এমনি শুনে খরগোস-জননী তাঁর ছা-বাচ্চাদের নিয়ে সেঁধিয়ে গেলেন তাঁর গর্তে।

উত্তর প্রত্যুত্তরের পালা চললো আরো কিছুক্ষণ। তারপর এসে হাজির হলো রাবণা কাঠুরে। বন্দুক কাঁধে নিয়ে তাঁবুর পাহারওয়ালা গরীব সিংও সঙ্গে এসেছে, আর এসেছে প্যাটেলের খামারদার। ওরা আমাদের জন্যে বহে এনেছে টিন কয়েক সিগারেট, ফ্লাস্ক ভরা চা আর বড় বড় তিনটে টিফিন ক্যারিয়ার বোঝাই রাতের আহার। পেট পুরে খেয়ে নিই আগে। মিসেস রাণার দূরদৃষ্টি আছে বটে!

খাওয়া সেরে হাত মুখ ধুতে চলি খালের জলে। রাবণা পেছু আসে ; ভাবি, বোধ হয় পাহারা দিতে। আসলে তা নয়। লুকিয়ে রেখেছে সে কোঁচার খুঁটে বেঁধে একটা নোংরা পুঁটলি—ন্যাকড়ায় বাঁধা ছোট্ট কিছু একটা আছে তার ভেতরে। তাড়াতাড়ি সেটা আমার হাতের মুঠোয় গুঁজে দিয়ে রাবণা বলে, 'বুড়ি তোমাকে পাঠিয়েছে—কি জানি বিশেষ কিছু হবে ঠিক। জঙ্গল দেওয়ের দিব্যি গেলে এসেছি তোমার হাতে তুলে দেবো। কেউ কিছু জানবে না।' রাবণা জঙ্গল দেওয়ের উদ্দেশে কপালে হাত ছোঁয়ায় আর বিড় বিড় করে বলে, 'আমি এতক্ষণে খালাস।'

আমি জানি কি আছে এই ন্যাকড়া বাঁধা পুঁটলিতে। জঙ্গলের সহস্র বিপদের বিরুদ্ধে আমার রক্ষাকবচ সেই মাদুলী। বুড়ি মায়ির সাত রাজার ধন এক মাণিক। কাল রাতেই আমি বুড়ি মায়িকে ফেরত দিয়েছি মাত্র। মাদুলীর গুণাগুণ হয়তো যাচাই হয়নি তখনও। তবু এ কথা ঠিক বৃদ্ধার এই বাৎসল্য যেন এক

দুর্ভেদ্য বর্মে ঢেকে দিলে আমার দেহটাকে। আমি অনুভব করলুম আমি দুর্বার, আমি অপরাজেয়। চেয়ে দেখি রাণাসাহেবেরও কিছু বাড়তি লাভ হয়েছে বৈকি। মিসেস রাণার লেখা কয়েক ছত্রের একটা ছোট্ট চিঠি। কে জানে অতটুকু চিঠি কত অপরিমেয় কিছু বহে এনেছে রাণাসাহেবের জন্যে। বৈগা উসখুস করতে শুরু করে। কেমন করে ওর মনে হঠাৎ বিশ্বাস জন্মেছে যে আজ রাতে একটা না একটা কিছু ঘটবেই।

বেলা পড়ে আসছে দেখে রাবণা কাঠুরে তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে ফিরে গেল। রাবণা জাত-কাঠুরে। এই বনের অন্ধি-সন্ধি কিছুই ওর অজানা নয়। তা ছাড়া চার চারটে মশাল আছে ওদের সাথে। বন্দুক তো একটা আছেই। বাড়তির ভেতর আছে দুটি বর্শা আর ওর গাছ কাটা কুড়াল। ভয় ডর কাকে বলে রাবণা জানেনা। তাই ওকে সাবধানে পথ চলার উপদেশ দিতেই কাঠুরে হেসে ফেলে—'সোনার ডরে আজ সারা বনে থরহরি কাঁপ লেগেছে। ওরা নিজেরাই সাবধান হতে ব্যস্ত। এখানে মাচানে বসে রাত জাগছো সাহেব। সখ হয়েছে সখ মেটাও। কিন্তু কাল সকালে যেয়ে শুনবে অন্তত গাঁয়ের আধ ডজন ছাগল গোরু সাবড়ে দিয়েছে ঐ গুলবাঘা আর লক্কর বাঘারা জোট বেঁধে।'

যা ভেবেছিলুম। রাত দুপুরে জ্যোৎস্না দেখা দিলে বটে, তবে ভাল করে চাঁদমুখ দেখবার আগেই মেঘ এসে ঘোমটা টেনে দিলে ওর মুখের উপর। ওদিকে কোথাও ঝাউয়ের বনে হাওয়া লেগেছে। ঝড় আসছে ভেবে চমকে উঠেছিলুম প্রথমটা। খালের ওপারে মুখোমুখি মাচানে বসে রাণাসাহেব আর কান্ধাই, এপারে বৈগাকে নিয়ে আমি। জমাট আঁধারের আড়ালে কত কি ঘটছে। চোখে সব দেখতে পাচ্ছিনা, কিন্তু কানে শুনতে পাচ্ছি। আর যত শুনছি ততই চোখ দুটো দেখবার জন্যে ছটফট করে মরছে। একটা হায়েনা ভরসন্ধ্যেবেলায় অনেকক্ষণ ধরে কাঁদুনি গেয়েছে। ভবঘুরে ফেউ

এদিক ওদিক থেকে সাড়া দিয়েছে, 'নিউ নিউ'। এক সময় ছুটো ফেউ মুখোমুখি থেকে হাতাহাতি পর্যন্ত করেছে কোন কিছুর ফয়সালা করবার জন্যে। একটু দূরেই একটা ভুতুম প্যাঁচা তার উদ্ভট গলায় অলুক্ষুণে ডাক ডেকে আমাকে হকচকিয়ে দিলে। চিলের চেঁচানির মত চেঁচিয়ে উঠল আর একটা পাখি। আমার কাছে টর্চ নেই। থাকলে বোধ হয় ধৈর্য থাকতো না আমার। জ্বালিয়ে দেখতুম।

মাথার উপরকার আকাশটাকেও ভাল দেখতে পাচ্ছিলুম না। ছুহাতে ডালপালা সরিয়ে অনেক চেষ্টার পর দেখলুম আকাশে অজস্র ছেঁড়াখোঁড়া মেঘের আনাগোনা। ওরা যেন চক্রান্ত করে উড়ে চলেছে চাঁদের মুখে কালি মাখাতে। মেঘের সাথে লুকোচুরি খেলতে খেলতে পলাতক চাঁদ এক এক সময় পৃথিবীর দিকে আড়চোখের কটাক্ষ করছে।

এমনি এক আবছা আলোতে দেখলুম যেন খালের ওপারে জলের ধারে দাঁড়িয়ে ছুটি জানোয়ার। ফেউই হবে হয়তো। ভালকরে কিছু বুঝবার আগে আঁধার এসে আড়াল করে ওদের। বারবার এমনি ব্যর্থতা সয়ে চোখ ছুটো মরীয়া হয়ে ওঠে। আমার আশপাশের সব যেন ভুতুড়ে চেহারার। দক্ষযজ্ঞের চেলা-চামুণ্ডাদের মত মাথায় তাদের ঝাঁকড়া চুলের রাশ, মুখটা যেন কিম্ভূতকিমাকার। বৈগা আমাকে ঠেলা দেয়। আমাদের গাছের তলে শুকনো পাতার উপর ভারিক্কী জানোয়ারের পায়ের শব্দ। কিন্তু দেখবো এমন সাধ্য কি ? চলার শব্দ মিলিয়ে গেল। আর যেই সে হোক না কেন বাঘ নয় সে জাতে—গুলবাঘ বা লক্করবাঘও নয়।

ভুতুম প্যাঁচাটা সময় বুঝেই চেঁচিয়ে ওঠে 'ভুত-ভুত-ভুতুম'। মাচানের পেছনটাতে একসময় একটা হুটোপুটি শুনে কান খাড়া করে রইলুম। ব্যস্, ঐ পর্যন্ত। আঁধার রাতে জানোয়ারের জ্বলন্ত চোখজোড়া অনেক সময় ওদের চিনিয়ে দেয়—সেই ছিল এক ভরসা। তবু অনেক চেষ্টা করেও কোথাও কিছু চোখে পড়লো না।

ঘুমিয়ে পড়তুম। কিন্তু মনে হলো জমাট কালো যেন একটু একটু করে হালকা হয়ে আসছে। দেখি, অন্তত আবছা আলোতে বনের রূপ দেখে হয়তো রাতের কষ্টের কিছুটা উসুল হতে পারে। ক্লান্তিতে আড়ামোড়া ভাঙছি। হঠাৎ ওপার থেকে সোনার গলার আওয়াজ এল কানে—'ঘউ ঘউ—খ্যাক্ খ্যাক্ খ্যাক্'। সোনার গলার শেষ আওয়াজগুলো কেমন বেখাপ্পা মনে হলো। বৈগাও আমাকে হুঁসিয়ার করে। সোনা আর তার দলবল সোরগোল তুলেই চুপ করলো। গলা বাড়িয়ে প্রাণপণে দেখতে চেষ্টা করি কি ঘটছে ওপারে। রাণাসাহেবের রাইফেলের গর্জন শুনে চমকে উঠলুম। জংলী কুত্তার দল আবার দু একটা ঘউ শব্দ করলে। তারপরে সব নিঝঝুম। মরীয়া হয়ে তাকিয়ে আছি।

মনে হলো খালের জলে সাঁতার দিয়ে এপারে এলো কোন জানোয়ার। হ্যাঁ, খালের গর্ভ থেকে ঐ যেন বনের দিকে এগিয়ে আসছে। ইস, এক ঝলক আকাশের আলো! ছায়ামূর্তি বনের জমাট অন্ধকারে হারিয়ে যাবে এক্ষুণি। যা থাকে বরাতে। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই ট্রিগার টেনে দিলুম। ছায়ামূর্তিও মিলিয়ে গেল বন্দুকের নলের মুখের ধোঁয়াটুকু মিলিয়ে যাবার আগেই।

কি জানি কি ঘটলো। ভুতুম প্যাঁচাটা চেঁচিয়ে উঠলো তার বেসুরো গলায়। একসঙ্গে ফেরুপালও তাদের সুরেলা সুরে যেন ভুতুমটাকে ধমক দিয়ে ওঠে। উত্তেজনায় দেহটা আপনা থেকেই এলিয়ে পড়ে।

প্রভাতের আলো গাছের ডালে নেমেছে। আমরাও নেমেছি মাচান থেকে। ভেলায় চেপে খাল পেরিয়ে আসছে রাণাসাহেব আর কান্ধাই।

'মহারাজ-মহারাজ'! চেঁচিয়ে ওঠে কান্ধাই। আমরা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। কান্ধাই অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে, 'মহারাজ খতম—মহারাজ মরেছে।'

মহারাজ! মহারাজ সে সত্যিই। যৌবন-গর্বিত রাজকীয় বপুখানি খালের পাড় থেকে বনের মধ্যে তুলে আনতে আমরা চার চারটে জোয়ান হিমসিম খেয়ে গেলুম। আমানুল্লার গুলির আঘাতে মহারাজের ডান পায়ের দুটো আঙুল ছিলনা। বনের নরম মাটিতে মহারাজের ঐ পায়ের চিহ্ন দেখিয়ে গাঁয়ের সবাই মহারাজের কীর্তির পরিচয় দিয়েছিল। রাইফেলের গুলিটা ডাইনের পেছনের পাটাকে কেটে বেরিয়ে গেছে। আমার জোড়াগুলি লেগেছে কপালের উপর। মহারাজের কপাল সত্যিই মন্দ। নইলে সোনা আর তার দলবল অমন সময়ে এসেই বা হাজির হবে কেন। মহারাজের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে সোনার দল দিব্যি জাঁকিয়ে বসে আহার করছে। ভূরিভোজনে তৃপ্ত হয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে ওরা একে একে তখন জল খাচ্ছে আর মুখ তুলে চাইছে আমাদের দিকে।

আমারও চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে বুড়ির সেই মাদুলীটাতে সত্যিই যাদু আছে কিনা। অবাক হয়ে আজও ভাবি সেই কথা।

এগারো

ত্রিকুট—আদ্যিকালের পৌরাণিক পাহাড় সে না যদিবা হয় আধুনিক কালের পুণ্য-পাহাড় তো বটে। তাই বোধ হয় ওর ইতিকথা শোনবার পর থেকেই কল্পনাও পাড়ি জমিয়েছে তার কল্পলোকের পথে। ক'দিন ধরে চেয়ে চেয়ে দেখছি শুধু ত্রিকুটের মেঘমোড়া মাথার ঐ রংবাহারী রাজ্যিটাকে। সেদিন এসেছিলুম সাতসকালে। চেয়ে দেখলুম চীনাংশুক পতাকা উড়িয়ে চলেছে হালকা মেঘের দল। প্রভাতী সূর্যের আলোর স্পর্শ পেয়ে চোখ মেলে চাইলো ওর শ্বেত শতদল। শাজাহানের সেই বড় সখের কোহিনুর-জ্বলা কিরীট যেন ঝলমলিয়ে উঠল ওর শুভ্রকেশ শিরে।

কল্পনা তো তখন ত্রিভুবন জুড়ে শুরু করেছে তার দৌড়। বল্গা বাঁধা মনটাও বুঝি বাগ মানতে চায়না আর। জানি, ঐ রামধনুর রঙ আঁকা রূপকথার রাজ্যে কোন কুঁচবরণ রাজকন্যে তার কালো-বরণ কেশ এলিয়ে বন্দিনী বসে নেই আমার প্রতীক্ষায়। না আছে মণিময় ময়ূর সিংহাসন কিংবা কৌস্তভ শোভা হার কি কেয়ূর। তবু যে কেন এমনি করে হাতছানি দেয় ওর ঐ অরণ্যচিত্রিত অজানালোক!

পাহাড়ে চড়ায় তেমন চোস্ত নয় আমার শ্রীচরণ দুখানি। কাল তাই কিছুটা তালিম দিয়েছি মাত্র। সত্যিকারের যাত্রা শুরু করেছি আজকেরই সাতসকালে। চলতে চলতে ঘড়ির কাঁটা যদিবা সকালের সীমা পেরিয়ে গেল, গাছের তলে অন্ধকারের ঘুম ভাঙেনি তখনও। নাগা সাধুর আশ্রম পেরিয়ে অনেকখানি এগিয়ে এসেছি আমরা। সুমুখের পথ সহজ নয়—স্পষ্ট দুর্ভেদ্য। হাঁপ ছাড়বার জন্যে শেষ পর্যন্ত বসে পড়লুম তাই মস্ত বড় এক পাথরের পিঠে। ফ্লাস্ক খুলে সবেমাত্র চায়ে চুমুক দিয়েছি, কানের কাছেই কলরব করে ওঠে একপাল—গতরাত্রের সেই পঙ্গপাল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি—হ্যাঁ, তাঁরাই তো। তবে সংখ্যার গুণতিতে এখন সাতজন। পরনে হান্টিং স্যুট, গলায় বাঁধা বিচিত্র রঙবেরঙের টাই, পায়ে কাঁটাওয়ালা বুট আর পৃষ্ঠদেশে এলায়িতা বেণী।

'হ্যালো মিস্টার, হ্যালো গুডমর্ণিং—মানে সুপ্রভাত'—পাথরটাকে ঘুরে কলহাস্যে সুমুখে এসে দাঁড়ান ইঙ্গবঙ্গের প্রতীকগণ। মেমসাহেবী চুলছাঁটা একজন দ্রুত প্রশ্ন করলেন ইংরেজীতে, 'হোয়াই ইউ লেফট হোটেল বিফোর আস? ইউ নো—হ্যাঁ, আপনি জানেন তো আমরাও আসবো। আসবার সময় আঁতিপাঁতি করে খুঁজেছি আপনাকে।'

'আমাদের গাড়িতেই আসতে পারতেন স্বচ্ছন্দে'—কটাক্ষ করেন অপরজন। তিনি একটু বেশি বয়সী অর্থাৎ বয়সের বিচারে

যৌবন তাঁর যাই যাই করেও বুঝি আটক পড়েছে কাজলটানা চোখের টানে, রুজ পাউডার আর লিপস্টিকে।

'আপনি বুঝি আমাদের কাল রাতের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন'—কম বয়সী আর একটি তরুণী বিনয় দেখান। 'তা আমাদের দোষ কি বলুন। মাছ মাংস ডাল চচ্চড়ি সবই এক সঙ্গে মেখে নিলেন আর যা গপগপিয়ে খাচ্ছিলেন না!'—মেয়েটি তার হাসি চাপতে না পেরে খিলখিল করে হেসে ওঠে। হাসতে শুরু করেন ওঁরা সবাই। হাসি পায় আমারও।

'দোহাই আপনার রাগ করবেন না। আপনার বোধ হয় খুব ক্ষিধে পেয়েছিল?'

'তা হয়তো পেয়েছিল'—সায় দিলুম আমি।

'তবে শুধু চা খেয়ে ক্ষিধেটাকে মাটি করছেন কেন অমন করে!' এগিয়ে এলেন তন্বী শ্যামা আর একটি তরুণী।

'বাপ! পাহাড়ে উঠলে নাড়ী পর্যন্ত চচ্চড়ি হয়ে যায় যেন। এই বিশু, খাবারটা নামিয়ে দে।'

বড় বড় এক ডজন টিফিন ক্যারিয়ারের বোঝা নামিয়ে বেচারা বিশু একটা লম্বা নিশ্বাস ছাড়লে ফোঁ-ও-ওস্। উপরোধে ঢেঁকি না গিলি ঢাক না গিললে রেহাই পাওয়া দায়।

রসনাই বোধ করি রসের পথ। মিঠাই মণ্ডার রসে সিক্ত রসনা বুঝি হৃদয়ের চোরা কুঠুরীর দরজা খুলে দিলে আর সেই খিড়কী দরজা দিয়ে গত রাত্রির গ্লানি যেন গা ঢাকা দিল চুপিসাড়ে। দোনলা বন্দুক কাঁধে ওঁদের পাহারায় এসেছে এক নেপালী দারোয়ান। এসেছে আরও কোয়ার্টার ডজন সাঁওতালী তীরন্দাজ।

আর এই রক্ষক বাহিনীর পদ অলংকৃত করেছেন যিনি তিনি নিতান্তই দেশী সাহেব। চাঁচাছোলা চেহারা, বয়সে তরুণ বটে; অতিমাত্রায় ফ্যাশান দুরস্ত, মেয়েলী ঢং-এর চালচলন, কণ্ঠে মিহি স্বর। কোমরে বাঁধা দামী চামড়ার পেটিকায় দুলছে তাঁর আরও দামী পিস্তল!

ভেতর বাহিরের এ হেন দুই দুর্ভেদ্য প্রহরা ভেদ করে কখন যে আমি ওঁদের এত কাছাকাছি এসে পড়েছিলুম তা আমি আজও জানিনা। অর্জুন পুত্র অভিমন্যু শুনেছি সপ্তরথীর বূাহ ভেদ করে প্রবেশ করেছিল, কিন্তু নির্গমন আর সম্ভব হয়নি শেষ পর্যন্ত। কথাটা মনে পড়তেই নিতান্ত তাড়াহুড়া লাগাই। মহাভারতের সপ্তরথীরা তো জানেন না যে সপ্তসখীর ব্যূহ বেষ্ঠিত হয়ে অভিমন্যুর তুলনায় অনেক বেশি ফাঁপরে পড়েছিলুম আমি।

বিগতযৌবনা যাঁর কথা বলেছি তিনি আঁৎকে ওঠেন আমার দুঃসাহসের পরিণাম ভেবে। দুহাতে তিনি চোখ ঢেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। ত্রিকুটের শের সমাজের দাপটের কথা কে না জানে। তাছাড়া বহাল তবিয়তে বংশ বৃদ্ধির ফলে ত্রিকুট নাকি রীতিমত শার্দুল-স্থানে পরিণত হয়েছে। এ হেন স্থানে এমনি নিরস্ত্র অবস্থায় চলেছি আমি!

তন্বী শ্যামা সেই মেয়েটি এলেন এগিয়ে। ওঁদের বন্দুকটি তিনি তুলে দিতে চান আমার হাতে। চলতে শুরু করেও থমকে দাঁড়াই। ত্রিকুটের মাথায় কেউ চড়েনা। যে চড়ে সে নাকি আর ফেরেনা। আমি যদি না ফিরি আর!

নাই বা ফিরলুম। না থাক। নিরস্ত্র তো আমি নই। অর্ধস্ফুট একটা ছোট্ট ধন্যবাদ—তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলি আবার।

একটানা খাড়াই পেরিয়ে চলি—খাড়াইয়ের পরে খাড়াই।

আরো কিছুটা হয়তো চলতুম একটানা কিন্তু মুখর বন্ধুটি যেন একেবারেই মুষড়ে পড়ল। চূড়া পর্যন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার চুক্তিতেই তো আজ বিশ বছর তাকে ভাড়া করে এসেছে সবাই। অথচ এর অর্ধেকটুকু পর্যন্ত তো কেউ আসেনি কোন দিনও। তবে কি সত্যিই আমি চূড়া পর্যন্ত পেঁাছে যেতে চাই। মুখর বন্ধুর মনের ভেতর একসঙ্গে অতগুলো কথা ভীড় করে আসতেই এবার সে নিতান্ত বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ত্রিকুটের মাথায় চড়ে

কেউ তো ফিরে আসেনি আজ পর্যন্ত। পয়সার লোভে তো আর পৈতৃক প্রাণটা খোয়ানো চলেনা। মুষহর বন্ধুটিকে নাছোড়বান্দা দেখে শেষ পর্যন্ত একটা শিলার উপর বিশ্রাম নিতে বসলুম আমরা। সঙ্গের পাঁউরুটি তিনজনে মিলে ভাগ করে খেলুম। এক ঢোক করে চা ওরা চেয়েই নিলে। মুষহর তবুও বড় মনমরা। নিরুপায় হয়ে ওকে বকসিস দিয়ে বিদায় করি। অর্ধেক কাজের বদলে ওকে পুরো মজুরী দিয়েছি—আবার বকসিস! একসঙ্গে চারচারটে গোটা টাকা। ঝকঝকে রূপোর আলোর ঝলকে ওর মনটার মধ্যে খুশির ঝিলিক ওঠে। বার বার করে হাতের উপর নাড়াচাড়া করে। ছোট ছোট চোখগুলো বড় থেকে আরও বড় হয়ে উঠতে থাকে। টাকার টুংটাং ওর মনের বীণার তারে যেন মীরজাফের কড়া টান দিয়েছে। এক লাফে উঠে দাঁড়াল মুষহর। তারপর হঠাৎ পালিয়ে গেল একছুটে। হোঁচট খেয়ে পড়ে আর কি।

মুষহর চলে গেল—ওর আনন্দের রেশটুকু শুধু রয়ে গেল আমার মনে। কিন্তু অবসর কই যে স্বস্তিতে এমনি শুয়ে থেকে আর দুদণ্ড কাটিয়ে দেবো। চোখের সুমুখে গর্বোদ্ধত মাথা তুলে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে ত্রিকুট। বোধ হয় ব্যঙ্গ করছে ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষুদ্রতর প্রচেষ্টাকে। এবার কিন্তু পথের চিহ্নমাত্র নেই আর। পাথরের পর পাথর পেরিয়ে এগিয়ে যেতে হবে উঁচু থেকে আরও উঁচুতে।

সবে মাত্র পা বাড়িয়েছি হঠাৎ কোথা থেকে মুষহর এসে সুমুখে দাঁড়ালো মুচকি হেসে। একরাশ ডাঁটা পাতা শিকড় বাকড় বহে এনেছে সে গামছার খুঁটে বেঁধে। সেগুলোকে আমার সাঁওতালী সঙ্গীর হাতে দিয়ে শুরু করলে এবার তার তুকতাক। মন্ত্রপড়ে আমার দেহবন্ধন করতে মুষহরের কিছু কম মেহনত হয় নি। তবে ওর ঐ মারাত্মক রকমের দলাই মলাইয়ের ফলে দেহটা বন্ধনে আড়ষ্ট হওয়ার বদলে বেশ কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠল।

বড় বড় আম কাঁঠাল গাছের শাখায় দোল খেয়ে বা হামাগুড়ি দিয়ে চলেছি খাড়াই বেয়ে। অশোক ফুলের একটা গাছ থেকে মাথার উপর ক'টি ফুল পড়ল টুপটাপ করে। বীরের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি বুঝি। বাতাসের দোলায় ওর ফুলসাজানো শাখাটিকে আমার নাগালের মধ্যে এগিয়ে দিয়ে অশোক ফুলের গাছটি যেন আমাকে ইসারায় বললে, 'আমার হাত ধরে এগিয়ে যাওনা কিছুটা।' হাত বাড়িয়ে ওর হেলানো শাখাটাকে দুহাতে চেপে ধরতেই হাতের তলে যেন সুড়সুড়ি দিতে শুরু করলে কে। হাত তুলে নিতেই ফণা উঁচিয়ে ওঠে সরু নীল রঙের এক সাপিনী। লাউয়ের ডাঁটার মত চেহারাটা বলে ওর চলতি নাম লাউডোগা। রক্ষে, সাঁওতালীর টাঙ্গিটাও তক্ষুণি এসে পড়ল ওর ঘাড়ে। নইলে এক্ষুণি এই পৃথিবীটাকে তো রেহাই দিতুম আমার দায় থেকে—আবশ্যি অতি সহজ, অতি দ্রুত নিঃশব্দ মুক্তি।

সাবধান হতে হলো। কিন্তু অচিরেই আবিষ্কার করলুম যে সর্পভয়ে গাছের শাখা আর লতাগুল্মের অবলম্বন ত্যাগ করলে চড়াইয়ের পথে পদস্খলন অনিবার্য। সুতরাং মাথা ফাটিয়ে ছটফট করে মরার চাইতে সাপিনীর কল্যাণে সোজাসুজি মৃত্যুর আঁধার পুরে পাড়ি দেওয়াই ভাল। অন্তত এই সখের দেহটাকে নিয়ে যমে আর জীবনে মিলে অভদ্রভাবে টানা হেঁচড়া কিছু সইতে হবে না।

মাথার উপরে সূর্যদেবের আট ঘোড়ার রথ যেন তখন ছুটে চলেছে উর্ধ্বশ্বাসে। জ্যা টানা ধনুকের মত বাঁকানো সড়ক বেয়ে তিনি আমারই মত আরও উঁচুতে উঠবার জন্যে লড়াই করছেন প্রাণপণে। পাহাড় চূড়াও যেন আমারই পায়ের তালে তাল রেখে উঁচুতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে একটু একটু করে। মানুষের অশুচি ছোঁয়াকে মাথায় নিতে পাহাড় বোধহয় বেজায় নারাজ।

লতার দড়িতে দোল খেতে খেতে বেশ সহজেই আমরা পাথরের খাড়াইগুলোকে ফাঁকি দিয়ে চলি। বড় বড় গাছ আর বাঁশের ঝাড়

জঙ্গলকে করে তুলেছে নিরেট দুর্ভেদ্য। গাছের তলে পাথরের গহ্বরে জমাট ঠাণ্ডা। অবিশ্রাম দোল খেয়ে পাথরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ি। তারপর শুরু হয় হামাগুড়ি দিয়ে ওঠা। শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে হাতে পায়ে ক্ষত দেখা দিয়েছে। শিরা উপশিরাগুলোর ভেতর দিয়ে চমক দিতে থাকে ঘন ঘন বিদ্যুৎগতি একটা জ্বালা। শরীরটা বেঁকে দুমড়ে আসে ধনুকের মত। পাথরের উপর হামাগুড়ি দিয়ে যখন চলি তখন বিশ্রামের অবকাশ নেই। এগুতেই হবে। নইলে আকাশ থেকে খসে পড়া তারার মত পাথর থেকে পিছলে পড়তে হবে ওর পরিধির শেষ সীমানায়। আর সে পরিধি তো সামান্য নয়। জিরাফের মত গলা বাড়িয়ে যে গাছগুলো মেঘের রাজ্যে মাথা গলিয়ে দিয়েছে, পাথরগুলো যেন তাদেরই সাথে পাল্লা দিচ্ছে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে।

পাথরের মাথায় উপুড় হয়ে পড়ে হাঁপাতে থাকি। জলের তেষ্টায় জিভ কেন গোটা দেহটাই যেন খাঁ খাঁ করতে থাকে মরুভূমির মতো। সঙ্গীর পিঠে বাঁধা লাউয়ের খোলা থেকে জল খাই, ন্যাকড়া বাঁধা নোংরা পুঁটলি খুলে মুটো মুটো চিঁড়ে মুখে পুরি। ক্লান্তিতে দেহটা যেমন দুমড়ে আসে, মনটাও তেমনি উপরের ঐ ধোঁয়ার মতই ধোঁয়াটে হয়ে ওঠে। বনটা যেন বড় বেশি নিঝঝুম। মরণকাঠি ছুঁইয়ে বুঝি সেই রূপকথার রাক্ষস এসে পাষাণ পুরীর প্রাণ নিয়ে উধাও হয়েছে।

এত দুঃখেও সাঁওতালীর মুখে হাসি ফোটে। এক চুমুক জলে জিভটাকে ভিজিয়ে নিয়ে গল্প বলার মত সমর্থ করে তোলে গলাটাকে। তারপরে ধুঁকতে ধুঁকতেও একটানা বলে চলে ওর গল্প।

ত্রিকুটের মাথায় আছে মেঘলোক। চাঁদের দেশের সিঁড়ি শুরু হয়েছে ওখান থেকেই। চাঁদের বুড়ি যখন চরকা কাটে একমনে তখন ওর কড়া পাহারাকে ফাঁকি দিয়ে আসমানের পরীরা নেমে

আসে মেঘলোকের সীমায়। ওদের জরীর ওড়না উড়তে থাকে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে। ওখানকারের নিত্যবাসিন্দা মোটে গোণা-গুণতি দুজন—রাবণের ভাই বিভীষণ আর রক্ষত্রাস পবননন্দন। তবে দুজনেই দুটি গুহার গহ্বরে বসে আছেন তপস্যায়। বছরে দু-একবার বড়জোর দেখা সাক্ষাৎ ঘটে দুজনের।

একবার এক সাহেবের সাথে সঙ্গী হয়ে গেছিল ওদেরই গ্রামের একজন। সে আজ এক যুগ আগের কথা। বিভীষণ মহারাজকে স্বচক্ষে দেখেছে সেই ভাগ্যবান। মেঘলোকের মেঘরাশি ভেদ করে তার দেহটা নাকি দৈর্ঘ্যে বাড়তে বাড়তে বৈকুণ্ঠলোকের দিকে এগিয়ে চলল। এহেন একটা কাণ্ড চোখের সুমুখে দেখলে কাণ্ডজ্ঞান তো দূরের কথা, শুধু জ্ঞানটুকুকে বাঁচিয়ে রাখাই যে দায়। তাই অজ্ঞান হয়ে পড়ার জন্যে আর কিছু দেখা হয়নি বটে। তবে পরীদের পায়ের পায়লের মিষ্টি রুনুঝুনু তারা শুনেছেই তো।

গল্পের শেষ না হতেই সাঁওতালী সঙ্গীর চমক ভাঙে। এই নিঝঝুম পাহাড়টার গভীর নীরবতাকে ভেঙে নিকটেই যেন শব্দ হচ্ছে কোথাও ঝুম ঝুমা ঝুম। কান খাড়া করে শুনি। সাঁওতালের কাঁধের তূণে তীর আছে—বিষ মাখানো মৃত্যুবাণ। তবে শব্দভেদী শর নেই একটি। তার দরকারই বা কি। ঐ তো মাথার উপরকার পথ বেয়ে হেলে দুলে গজেন্দ্রগমনে চলেছে আলালের ঘরের দুলালের মত বেশ তেল কুচকুচে নাদুসনুদুস চেহারার একটি সজারু। সাঁওতালের তীরের এক ঘায়ে বেচারী যেন ভীষ্মের শরশয্যায় শুয়ে পড়ল দিব্যি নির্ভরতায়। সত্যিই অরণ্যরাজ্যে এমনি নিশ্চিন্তে চলার মত করে আর কাউকে সৃষ্টি করেনি বিধাতা। ওর গায়ে আঁটা শত তীরের বর্ম। বিধাতার দেওয়া এই বর্মের বলেই সে অনায়াসে একটা আনাড়ী বাঘকেও শাসনে রাখে। ওর গায়ের লম্বা কাঁটাগুলো ধরে সাঁওতাল ওকে শূন্যে দোলায় দোদুল-দুল। তারপর হা হা হাসির হঠাৎ একটা দমকা আতিশয্যে আমাকে চমকে দেয়।

রোদের একটা দমকা ঝলকে তখন ত্রিকুটের মাথাটাও যেন জ্বলে উঠল শত সূর্যের মত। এতক্ষণে বুঝি আমরাও এসে দাঁড়িয়েছি একটি চূড়ায়। ঠিক সুমুখেই মাথা উঁচিয়ে আছে ত্রিকুটের সব চাইতে উঁচু চূড়াটি। শিকার ছেড়ে সঙ্গী আমাকে আঙুল উঁচিয়ে দেখায় ঐ তো সেই স্বপনপুরী। আত্মবিস্মৃত হয়ে দুহাত বাড়িয়ে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে হঠাৎ। ওর বউ গল্প শুনতে ভালবাসে। সারা জীবন ধরে এবার সে গল্প শোনাতে পারবে যে—এত আনন্দ সে কল্পনাও করেনি কোনদিন। অতএব ঐটুকু উঠতেই হবে। জান কবুল।

আর একটি চূড়া—শেষ চূড়া। ঐ তো দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফেলে আসা মাটির পৃথিবীটাকে—ফিকে সবুজ রঙের ধোঁয়াটে ধরিত্রী। এবড়ো থেবড়ো কেমন যেন চেহারাটা। কিন্তু কত মায়া ওর চোখে। যাক, এখন ওকথা নয়। আবার সুরু করি সংগ্রাম —পাথরের সাথে মানুষের। পাহাড় যেন তার তামাটে চোখজোড়া রাঙিয়ে ভ্রূকুটি করছে—হুঁসিয়ার, এই পর্যন্ত, আর এগিয়ে এসোনা। অরণ্য পরিবেশেও যেন এমনি রুক্ষ হুঁসিয়ারী। লতার দোলায় দোল খেয়ে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছি—টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়লুম হঠাৎ মস্ত বড় এক পাথরের সূঁচালো মাথাটা থেকে। নাক দিয়ে বুক বেয়ে নেমে এলো রক্তের ধারা। বহুক্ষণ ধস্তাধস্তির পরও পাষাণ পুরীর এই অন্ধকূপ থেকে মুক্তির কোন উপায় খুঁজে পাই না। কিন্তু মানুষের দুষ্টুবুদ্ধির কি হার আছে কোনদিনও। অনেক কসরৎ করে শেষ পর্যন্ত ওর ধারালো টাঙ্গিটাকে আমার হাতে পৌঁছে দিতে পারলে বটে তবে পাথরের মাথায় নামতে যেয়ে বন্ধুটিও আছাড় খেলো বড় কম নয়। ডাল কেটে মই বানিয়ে গহ্বরের গর্ভ থেকে আমি যেয়ে চড়লুম আর এক পাথরের মাথায়। লতার দড়ি বাড়িয়ে দিয়ে টেনে তুললুম সাঁওতাল সঙ্গীকে।

উপরে তো উঠলুম। কিন্তু ব্যাপার দেখে যে চক্ষুস্থির। সুমুখে যতদূর দেখা যায় সাজানো রয়েছে শিলার পরে শিলা। কমপক্ষে একুনে একটা তিনতলার উচ্চতা তো হবেই। একটু দম নিতে হলো আবার তুজনকেই। বুকের ভেতরটাতে বাতাসের বাসস্থানটি যেন কুঁকড়ে গুটিয়ে এসেছে। সাঁওতাল বন্ধু হাঁপায় তবু হাসে আর বলে, 'জান কবুল'।

আবার সেই মরণপণ লড়াই—বুকে হেঁটে সন্তর্পণে এগিয়ে চলা। হাঁটুর কাছে ব্রীচের অমন জবরদস্ত জায়গাটাও এক সময় নিতান্ত নির্লজ্জের মত হাঁটু তুটোকে আলগা করে দিলে। পাহাড় কি পরাজয় নিতে চায়। অজগরের আক্রোশের মত আমাদের গায়ের চামড়া মাংস টুকরো টুকরো করে টেনে ছিঁড়ে দেয়। হাঁটু, কনুই আর হাতের তলায় রক্ত ঝরে অঝোরে। তেষ্টায় কাঠ হয়ে আসে গলা, জিভটা হয়ে ওঠে রুক্ষ ধারালো। মুখের ভেতরকারের জলে ভেজানো রুমালটাকে মরণকামড় দিয়েও এক ফোঁটা রস নিঙড়ে বার করতে পারিনা। বুকের ভেতর থেকে বাতাসটাকে ছাড়তে ভয় পাই। কিজানি আবার যদি ফিরে না পাই। দেহের রক্ত দিয়ে যাত্রাপথের চিহ্ন এঁকে চলেছি। কিন্তু এমনি করে কতক্ষণ চলাই বা সম্ভব। তাই পাথরটার প্রায় শেষ সীমায় পেঁ ৗছে গেছি দেখে ওর পাশের সমতল স্থানটুকুতে হিঁচড়ে নিয়ে গেলুম দেহটাকে। ব্যস্, ঐ পর্যন্তই।

আকাশের আলো হয়তো ঢাকা পড়েছে জমাট কুয়াশায়। কিন্তু চোখের আলো! সেও যেন নিবে গেল। সঙ্গীর চেঁচামেচিতে যখন আবার সম্বিত ফিরে এলো তখন দেখি আলো-ঝলমল আঙিনার একপাশে পড়ে আছি আমি। এ যেন আনন্দের হাটে এসে গোমড়ামুখ করে আছে কোন অরসিক। পাহাড় চূড়ার কালো পাথরটাকে জাপটে ধরে কুকুরের মত জিভ বার করে জোরে জোরে শ্বাস টানছে সঙ্গীটি। প্রাণপণে একটা দম নিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল

আর একবার। আমরা তাহলে সত্যিই পৌঁছে গেছি পাহাড় চূড়ায়।

ছোট্ট আঙিনাখানিকে চেয়ে দেখি। চার পাশেই তার পাথরের বেষ্ঠনী। বেষ্ঠনীর গা বেয়ে কোথাও বা আলো করে আছে কামরাঙা ফল, কোথাও বা সার বেঁধে বনফুলের মেলা। ফুটন্ত ফুলের গন্ধে বাতাসটাও বেশ উতলা!

রাতের জোছনায় এই আঙিনাখানি পরীদের প্রমোদ আসর হবার যোগ্য স্থানই বটে। হিমালয়ের তুষারধবল গিরিপথে চাঁদের আলো যখন চুমা দেয় রঙবাহারী ফুলের গুচ্ছে তখন তার স্বপ্নজালে জড়িয়ে পড়ে মানুষের বুভুক্ষু চোখজোড়া। কিন্তু এ যে আর এক কুহক। আকাশের আলোর রঙ বদলের সঙ্গে বহুরূপীর বেশবিন্যাসের পালা চলেছে তার। সে এক এলোচুলের অপ্সরা—এলোমেলো কবরী থেকে আলুথালু ফুলসাজ খসে পড়ছে টুপটাপ করে। রাত্রিশেষের অগোছালো বাসর—তবু সবটা মিলিয়ে ছন্দের ছেদ নেই কোথাও।

উপরের নীল আকাশের চাঁদোয়ার তলে মেঘ আর রোদের লুকোচুরির খেলা শুরু হয়েছে ওদিকে। সাঁওতাল ইসারা করে দেখায় আকাশের গায়ে উড়ে চলা ছেঁড়া-খোঁড়া কালো মেঘের অশুভ চেহারাটাকে। চাঁদ ওঠবার আগেই হয়তো ওরা দানা বেঁধে উঠে এই পৃথিবীটার গলা টিপে ধরবে। বেলা পড়ে আসছে এদিকে। সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলুম—কি করা যায়। কোরবার আছেই বা কি। জল নেই, খাবার নেই—সব আমাদের নিঃশেষ হয়ে গেছে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আছে মরুভূমির মতো। ক্ষিধের তাগিদে পেট এসে লেগেছে পিঠে। আর পরিশ্রমের ধমকে পা দুটো টলছে মাতালের অভ্যস্ত ভঙ্গিতে।

মনটাকে একটা প্রচণ্ড রকমের ঝাকুনি দিয়ে চাঙ্গা করে তুলি। ক্যামেরায় ছবি তুলেও মনটা খুশি হয়না। তাই পাথরের গায়ে

খোদাই করে এঁকে রাখি আমাদের নাম আর সেদিনের সন তারিখ। তারপর উতরাই পথে চললুম পাহাড়ের আর এক চূড়ায়। বেসামাল পাহুটোকে নিয়ে বেগ পেতে হলো কম নয়। গোটা দেহযন্ত্রটা যেন থেমে যেতে চাইছে। কিন্তু ওদিকে যে প্রকৃতিও কোন ভীম ভয়ঙ্করের ভয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। এমন থমথমে ভাবটা দেখে ভালো লাগবার কথা নয়। আকাশকে চেয়ে দেখি তাই। নিকষ কালো মেঘের পর্দা যে পাষাণভার হয়ে চেপে বসেছে ওর বুকে। আমাদের মতই আকাশটাও গুমরে মরছে অব্যক্ত বেদনায়। এক্ষুণি জল ঝরবে ওর চোখে। পা চালিয়ে যতদূর পারি নিচে চলে যাই।

যাচ্ছিলুমও। হঠাৎ যেন মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে যেতে পাহাড়টা আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল কোনমতে। হু হু শব্দে হুঙ্কার ছেড়ে ভূতনাথের চেলাচামুণ্ডার দলে ঝাঁপিয়ে পড়ল দক্ষ মহারাজের যজ্ঞে। শুরু হলো পাঞ্জা কষা—ঝড়ে আর পাহাড়ে। টাল সামলাতে না পেরে পাথরের মাথা থেকে গড়িয়ে পড়লুম গাছের গোড়ায়। সাঁওতাল বন্ধুটিও ছিটকে পড়েছে এক অন্ধ ফাটলের মস্ত হাঁ-এর মধ্যে। পাথরের আড়ালে আত্মরক্ষা করে এগিয়ে আসছে আর প্রাণপণে চেঁচিয়ে মরছে—'বাবু, বাবু'। শন্-শন্-শন্—দমকা হাওয়া যেন রাগে ফেটে পড়ে। আর্ত চীৎকারে গাছেরাও চেঁচায় হুস্-শুষ-স্থ—মড়-মড়-মড়াৎ। গোটা বনটা জুড়ে জাগে বুকফাটা বিলাপ।

বাতাসের সঙ্গে এসে যোগ দিলে বৃষ্টি। আনন্দ আমাদের দেখে কে। আত্মহারা হয়ে হাঁ মেলে ধরি চাতকের মত। এক গণ্ডুষে বোধ হয় গোটা সমুদ্দুরটাকেই শুষে নিতে পারি জহ্নু মুনির মত। মাটির গর্ভের একরত্তি বীজ বৃষ্টির ছোঁয়া পেয়ে ফুলে ফেঁপে প্রাণবেগে ফেটে পড়ে দেখেছি। অমরাবতীর অমৃত পান করে মৃত নাকি প্রাণ পায়। বৃষ্টি কিন্তু আমাদের আধমরা প্রাণটাকেই শুধু পল্লবিত করে তুললে এমন নয়, মনটাকেও যেন কি এক সঞ্জীবনী

মন্ত্রে করে তুললে আনন্দচপল। ছোট ছেলের মতই জল নিয়ে যেন এক হুটোপুটি খেলায় মেতে উঠলুম আমরা—বড় বেপরোয়া বেহিসেবী উল্লাস।

বন জুড়ে বৃষ্টি তার চাবুক চালিয়ে চলেছে সপাং-সপাং। কতক্ষণ আর এমনি দাঁড়িয়ে সইতে পারা যায়। পাঠশালার আলসে পড়ুয়ার পিঠেও এর চাইতে বেশি জোরে পড়েনা গুরুমশায়ের কঞ্চির ছাট—আর এত ঘন ঘন এমনি চটপট। তাছাড়া ঝাঁকড়া মাথা গাছগুলোর জটাজূটের একটি যে আমার মাথাটা লক্ষ্য করে আচমকা তার ভারটা এলিয়ে দেবে না এমন কথা তো কেউ হলপ করে বলতে পারেনা। গোটা গাছটাই হয়ত বাতাসের যুযুৎসু প্যাঁচে চিৎপাত হয়ে পড়তে পারে আমার ঘাড়ে কিংবা গন্ধমাদনের একটা ক্ষুদে সংস্করণ উপর থেকে আহ্লাদে ছেলের মত গড়িয়ে এসে দিব্যি চড়ে বসতে পারে আমার মাথার উপর।

ভাবনাটা মগজে মাথাচাড়া দিতেই পা দুটো তৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু এই ডামাডোলের মাঝখানে সোজা হয়ে চলতে পারে এমন সাধ্য কি চরণযুগলের। বুকে হেঁটে পাথরের আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে তাই কোনমতে প্রাণ বাঁচিয়ে দেহটাকে হিঁচড়ে টেনে চলি নিরাপদ কোন আশ্রয়ের সন্ধানে। হঠাৎ যখন দমকা হাওয়া ধেয়ে আসে হাততালি দিয়ে, তখন আমরাও দুহাত বাড়িয়ে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরি সুমুখের কোন শক্ত অবলম্বনকে।

এবারেও ধরেছিলুম বেশ বড় গোছের একটা পাথরকে। কিন্তু অতবড় পাথরটাই যে ঝাঁকুনি খেয়ে পিছলে পড়ল কয়েক পা। পিঠের উপর থেকে ক্ষুদে মানুষদুটোকে মাটির ঢেলার মতো সে দিব্যি ছুঁড়ে ফেলে দিলে পাতালপুরীর গভীরে। ত্রিকুট যেন এতক্ষণে তার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিলে। কিন্তু পাথর তো আর জানেনা যে মানুষের প্রাণবস্তুটি পাথরের চাইতেও শক্ত। মানুষ কি মরেও মরে, না তার আত্মরক্ষার তাগিদ হারায়। থ্যাঁতলানো

দেহটা এত কাণ্ডের পরেও যন্ত্রচালিতের মত হাতে পায়ে হেঁটে চলেছে দেখে বোধ হল যে আমি বেঁচে আছি।

সুমুখেই সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ পথ। চোখে এত ঝাপসা দেখছিলুম যে দশগজ দূরের জিনিসটাকেও ঠিক ঠাওর হয়না। নইলে দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাংশুটে চেহারার ঐ বিশালদেহী জানোয়ারটাকে গরিলা ভেবে ভড়কে যাব কেন। অমন একটা যমদূতের পাল্লায় এসে পড়তে হবে সেকথা স্বপ্নেও ঠাঁই পায়নি মনে। বিপদে পড়লে মানুষের ইন্দ্রিয়গুলিও বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গেই সজাগ হয়ে ওঠে। দুচোখ রগড়ে নিলুম বাম হাতে। ডান হাতটা তখন আপনা থেকেই কোমরে ঝোলানো ছোরাখানির উপর শক্ত হয়ে চেপে বসেছে।

সঙ্গীর সাড়া পাইনা দেখে দুপা পেছু হটে একটু আড়াল খুঁজছি। চেয়ে দেখি সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করছে সাঁওতাল। ওদিকে সেই মহাবলী মনুষ্য বিশেষটিও এক লম্ফে চড়ে বসল মাথার উপরকার পাথরটিতে। ওর লম্বা লাঙ্গুলটি দেখে রামায়ণের বালি মহারাজের কথাটাই মনে পড়ে গেল। রাবণরাজার মত লাঙ্গুলের ফাঁসে গলা গলিয়ে দিয়ে সাত সমুদ্রের জল না গিলি, পাহাড় থেকে ঝড়ো হাওয়ায় গড়িয়ে পড়া পাথরের মত মহাপ্রস্থানের পথে পৃথিবীর মাটিতে এসে নেমে পড়তে চাইনা।

সাঁওতালের সত্যি বিশ্বাস জন্মেছে যে রামায়ণের সেই সহস্র অঘটনের নায়কই সশরীরে এসে হাজির হয়েছেন সুমুখে। আজগুবি বলে উড়িয়ে দিতে চাইলে তো চলবেনা। রামচন্দ্রের বরে চারযুগের আদি থেকে অন্ত পর্যন্তই তো তিনি অমর। রামায়ণের হনুমান মহাভারতে তাইতো সাক্ষাৎ বর্তমান। সত্যযুগে লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়ে ত্রেতা পেরিয়ে দ্বাপর যুগে তিনি গোটা মহাভারতটাই প্রত্যক্ষ করেছেন কপিধ্বজের মাথায় চেপে। কলিতে তিনি ত্রিকুটের চূড়ায় চড়ে তপস্যা করবেন এটা আর এমন কি আজব ব্যাপার। দৈহিক দৈর্ঘ্য-প্রস্থের কথা ভুলবেন না যেন। ইচ্ছেমত দেহটাকে বাড়িয়ে

খুশিমত আকাশ ছুঁতে পারেন তিনি; যোজন প্রমাণ হয়ে সাগর লঙ্ঘন করেন শতেক যোজন। আবার সেই উদ্ভট আয়তনটিকে দরকার মত সঙ্কুচিত করে সুরসা সাপিনীর নাসারন্ধ্র দিয়ে গলে আসতে পারেনও স্বচ্ছন্দে।

এত কথার পরে নিদেন পক্ষে কুশল সম্ভাষণটুকু না করে সরে পড়ি কোন মুখে। আর সঙ্গীটি তো ততক্ষণে ভক্তি গদগদ হয়ে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়েছে। প্রণামের প্রাবল্যে পাথরের গায়ে মাথা ঠুকছে যেন। নিঃসঙ্গের সঙ্গী, পাহাড়ের পুণ্যপীঠে অরণ্যের আলো আঁধারে অংশীদার। ওকে ফেলে বাঁচাটাও যে আর এক মরা। তাই সাত পাঁচ ভাবতেই হলো। এদিকে পবন দেবের তাণ্ডবে গোটা পাহাড়টা টলমল। ওদিকে পবনপুত্রের রহস্যময় চালচলনে মনটাও পুরোদস্তুর চঞ্চল।

অন্তর্যামী হনুমান আমার মন বুঝেই মুখ রাখলেন বোধ হয়। এক লম্ফে উপর থেকে নেমে এলেন সুরঙ্গ পথের উপর। দ্বিপদী ভক্তদ্বয়কে বেশ বিনীত গোছের ভদ্রলোক দেখে মনে মনে বেশ কিছুটা খুশি হলেন নিশ্চয়। অচিরে হাতে পায়ে হেঁটে সুরঙ্গের শেষ প্রান্তে গিয়ে মস্ত একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন মানুষের মত। মিটমিট করে এবারে ঘন ঘন চেয়ে দেখলেন আমাদেরকে। কি যেন বলি বলি করেও মুখ ফুটে বলতে পারলেন না বুঝি। বার দুই গা মাথা চুলকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত দিব্যি দুপায়ে পাথরটাকে পাক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ক'টা মিনিট মোটে। আবার দেখি আগের পথেই পাথরের আড়াল থেকে আলোতে এসে হাজির। লাফিয়ে পাথরখণ্ডটার মাথায় চেপে ওপরকারের কোন পথ বেয়ে গম্ভীর পদে এবার তিনি অন্তর্হিত হলেন অজানায়।

সাঁওতাল বলে, 'এগিয়ে চলো বাবু, হনুমান আমাদের আশ্রয় নিতে বলছেন।' গুটি গুটি এগিয়ে এসে দেখি সুরঙ্গ পথের শেষে মুখোমুখি দুটি গুহা। এরই একটিতে হনুমান প্রবেশ
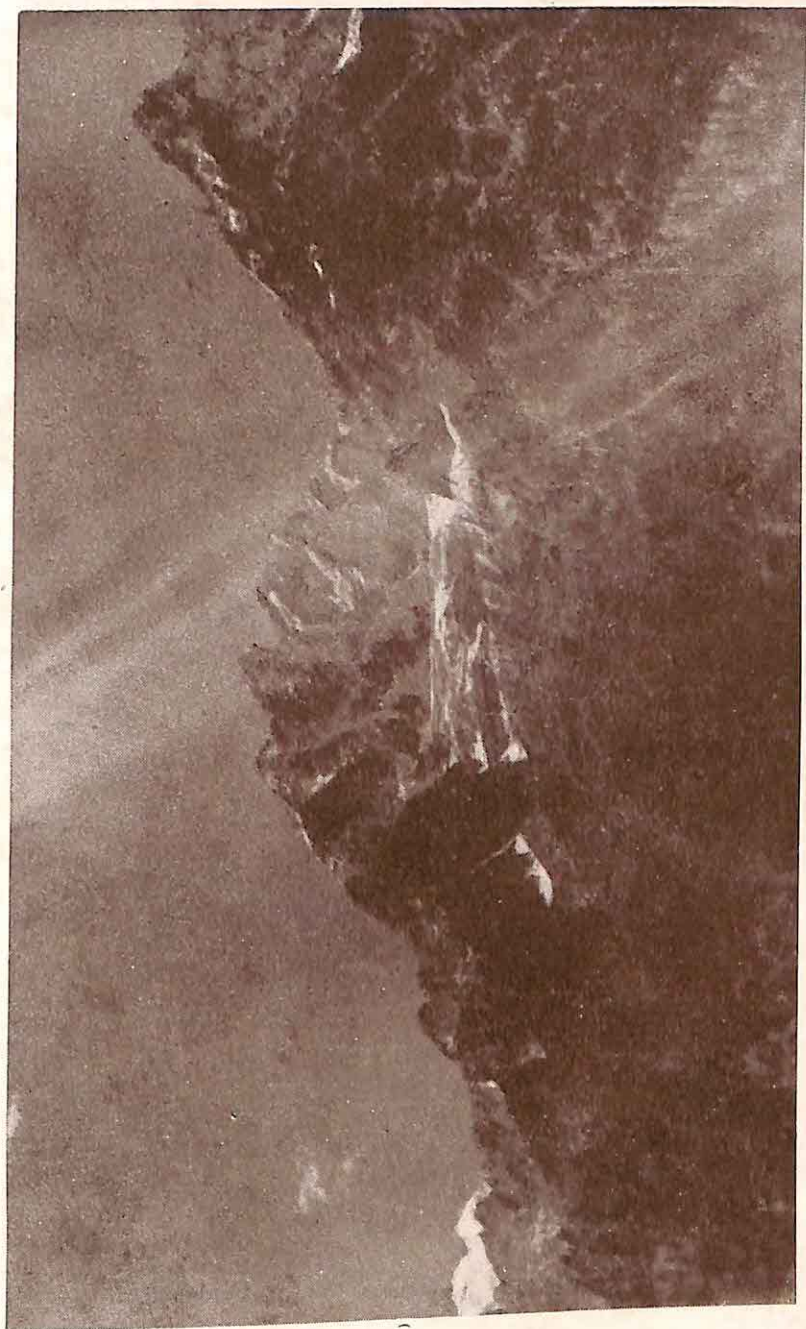
করেছিলেন এক্ষুণি। গুহামুখে মস্ত একখানি পাথর এমনিভাবে দাঁড়িয়ে যে চার পায়ে চলে এর ভেতর ঢুকে পড়া দুঃসাধ্য। ঝড়বৃষ্টির দুরন্ত দাপট সয়ে দেহটা তখন এমনি মরীয়া হয়ে উঠেছে যে অগ্র-পশ্চাৎ ভেবে দেখবার অবকাশ কই। তবে পাথরের ফাঁক দিয়ে দেহটাকে গলিয়ে গুহার মধ্যে ঢুকতে বেশ কিছুটা কসরৎ করতে হলো বৈকি।

শিকার ফসকে গেলে সুন্দরবনের বাঘ যেমন তার ক্ষুব্ধ গর্জনে বন কাঁপিয়ে তোলে, পবনদেবের ব্যর্থ আক্রোশ তেমনি হুঙ্কার ছেড়ে ঘুরে মরছিল সুরঙ্গ পথের পাষাণ প্রাসাদের সিংদরজায়। অন্ধকার গুহা—জমাট আঁধার। আগুন জ্বেলে একবার তার চেহারাটা দেখে নিতে হবে। কিন্তু এতক্ষণে হুঁস হলো যে আমার কাঁধের বোঝা কাঁধ থেকে কখন সরে পড়েছে কোনরকম হুঁসিয়ারী না জানিয়ে। চা আর জলের ফ্লাস্ক, টিফিন ক্যারিয়ার, ক্যামেরা, প্রাথমিক চিকিৎসার ক্ষুদে চর্মাধারটি—সব উধাও। টর্চটা ছিল সঙ্গীর হেফাজতে। তাই সেটি খোয়া যায়নি—অবিশ্যি অক্ষত থাকা তো অসম্ভব। বিশেষ করে নিজেরাই যখন ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটের বাজে কাগজের সামিল হয়ে পড়েছি।

কাঁচ-ভাঙা টর্চের আলোর প্রতিফলনে আবছা আলোয় যেন হেসে উঠল চারিদিকটা। গুহার ভেতরকারের চেহারাটা দেখে কিন্তু মনে মনে চমকে উঠলুম আমি—ভয়ে নয়, বিস্ময়ে। মস্ত বড় গুহা—ভেতরটা যেন দস্তুরমতো ধোপ-দুরস্ত। ঝকঝকে তকতকে করে এইমাত্র তাকে নিকিয়ে রেখেছে কে। ফটকের পাশেই দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করানো একটা মস্তবড় গুঁড়ি—প্রবেশ পথের ফাঁকটুকুকে ভেতর থেকে বন্ধ করবার জন্যেই বোধ হয়। এক পাশে জড়ো করা একরাশ ফলমূল। লাউয়ের খোলার মত আধারে পানের জল। সাধু মোহান্তের আবাস বটে।

সাঁওতাল হেসে বলে, 'সাধু মোহান্তটি কিন্তু তোমার আমার

মত দ্বিপদী মানুষ নয়, চতুর্ভুজ হনুমান। এটি মহাতাপস হনুমানের আশ্রম। এই আশ্রয়, আহার আর পানীয় সব আমাদের।' বৃষ্টির জলে পেটের ক্ষিধের তাগিদটুকু যেন উবে গেছিল এতক্ষণ। কিন্তু আয়ত্তের মধ্যে আহার্য আছে শুনতেই পেটটা যেন বায়না-ধরা ছেলের মত খাই-খাই করে কলরব তুলল। খেতে খেতেই জলেভেজা জামাকাপড় নিঙড়ে নিচ্ছিলুম আর ভাবছিলুম এই আশ্রয়ের কথা—তার আশ্রয়দাতার কথাও।

দিব্যি আরামে জীর্ণ ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিয়েছি। বাইরের দুরন্ত বাতাস তখন পাথরের ওপিঠে এসে আছাড় খেয়ে পড়ছে আর্ত চীৎকারে। সে এক মন মাতানো গান বটে। শত শত গরুড় যেন ডানার ঝাপটে হিমালয়ের হিমশৃঙ্গগুলিকে গুঁড়িয়ে স্বর্গসুধার অভিযানে চলেছে শূন্যপথ বেয়ে। আকাশের বুক চিরে চমকে ওঠে বিদ্যুৎ, পৃথিবীর বুকটাও চিরে যায়। সুরঙ্গ পথের উপর দিয়ে আলোর তরঙ্গ বয়ে যায় যেন গলিত লাভার একটা ছুটন্ত স্রোত—ফুটন্ত প্রবাহ।

রাত্রি ন'টা নাগাদ প্রকৃতির রাগ পড়লো। নীরব পাহাড়—নিঝঝুম তার অরণ্য—আরণ্যকের দলও। মন্থনের পর শূন্যগর্ভ সমুদ্র সদ্য খোলস-ছাড়া সাপের মতই যেন নির্জীব। এহেন একটা দক্ষযজ্ঞের পরেও আমার ক্ষুদে হাতঘড়িটা কিন্তু একটানা আবৃত্তি করে চলেছে—টিক্-টিক্-টিক্। পেট্রল ম্যাচের পলতেটা জ্বালতেই টের পেলুম যে ওর কাঁচ আর মিনিটের কাঁটার কোন হদিস নেই। প্রভুভক্ত যন্ত্রটি তার প্রভুর মতই জীর্ণ ক্লান্ত, তবে একেবারে থেমে যায়নি তখনও। একটা পাতাও শুকনো নেই যে আগুন জ্বালবো। তাই কারণে অকারণে পেট্রলের পলতেটা জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাই, চুরুট জ্বালাই আর ঘন ঘন ঢোক গিলি। অসহ্য অন্ধকার—কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায় জমানো সাদা স্তূপের মত জমাট ভারী অন্ধকারের স্তূপ। সিগারেটের মাথায় ঐটুকু ছাইচাপা আলো সেও আজ

পরম বাঞ্ছিত চরম ভালো। একটা কাবুল বা একটা বোখরার বদলে ঐটুকুকেও বিকিয়ে দিতে রাজী নই আমরা। রূপকথার সেই অজগর যদি তার মাথার মণিতে আকাশের একটা মিটমিটে তারাকে বেঁধে আনে তাহলেও দুদণ্ড চোখ দুটো একটু স্বস্তি পায় বৈকি। দুর্দৈব তো আসেই জীবনে, কিন্তু এমন রূপকথার রাত!

সাঁওতাল তার টাঙ্গিটাকে ঘাড়ে চাপিয়ে পাহারা দিচ্ছে প্রবেশ পথ আর গল্প বলছে অনর্গল। গল্প মানে ওর গাঁয়ের কথা, ওর প্রণয়ের কথা। ওর নাকের নিশ্বাসগুলো থেকে মনে হচ্ছে আজ তার দেহে এসেছে দুরন্ত ক্লান্তি, কিন্তু কি এক সঞ্জীবনী সুধার ছোঁয়া পেয়ে মনে এসেছে মত্ত হস্তীর বল।

ঘুমিয়ে পড়া চলেনা। তাই অকারণে হাণ্টারের ভেতর থেকে গুপ্তিটাকে টেনে বার করে ওর ধার পরীক্ষা করছিলুম। ভাবছিলুম, লক্ষ্মণের তূণে কি এর চাইতেও তীক্ষ্ণতর কোন অস্ত্র ছিল নিদ্রাদেবীকে শাসনে রাখবার মত। ছিল ঠিকই। তন্দ্রাঘোরে না থাকলে তর্জন গর্জনেই শুধু এতখানি বেসামাল হয়ে পড়বো কেন। অরণ্যচারীর ক্রুদ্ধ হিংস্র হুঙ্কার তো আর নতুন শুনছিনা আজ। সাঁওতাল সাড়া দেয়, 'ডর কি বাবু, আমি তো জেগে আছি। জানোয়ারের লড়াই লেগেছে সুরঙ্গ পথে।'

লড়াই লেগেছে ঠিকই আর চলেছেও সেটি একেবারে আমাদের নাকের ডগায়। যে শিলাস্তূপের আড়ালে আমরা আত্মরক্ষা করছি তারই অপর পিঠে যুধ্যমান দুই পক্ষ আছাড় খেয়ে পড়ছে মাঝে মাঝে। ওদের গর্জনের বহরটা তো কিছু কম নয়। অরণ্যচারীর জাতে ওরা রাজাধিরাজ তো বটে। রয়াল বেঙ্গল না হোক, রয়াল বিহার। কানে তাই তালা লাগতেও পারতো। বিশ পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই লড়ায়ের একটা ফয়সালা হয়ে গেল—সেই যা রক্ষে।

ঘড়ির ঐ ক্ষুদে কাঁটাটাও বুঝি আমারই মত ক্লান্ত। তবু সে খুঁড়িয়েও চলেছে ঠিক। একঘেয়ে হাই তুলতে তুলতেও একটানা

শুনছি ওর 'টিক-টিক'। আরণ্যকের দল ফিরে আসছে তাদের আস্তানায়। রাতের শেষ প্রহর মুখর হয়ে উঠেছে ওদের সহস্র সঙ্কেতে। ভূরিভোজনের পরে চাপা স্থরে ঢেগুর তুলছে কেউ —'আ-হেউ-উ', কেউবা পেটের ক্ষিধেয় অসন্তুষ্টি জানাচ্ছে 'হু-হুম-গোঁ-ও'। কেউবা আবার একেবারে খালি পেট নিয়ে তারস্বরে তার ক্ষিধের বিরক্তিকর উপদ্রবটাকে ধমক দিচ্ছে—'কেঁউ-কেঁউ-হা-আ-হা'। 'আ-হাউ'—কেউ বোধ হয় ঘুমের আমেজে আড়ামোড়া ভেঙে নিল। হ্যাঁ, আরও আছে। প্রণয় আলাপনের ভাষাটা ওদের মধুর নয় হয়তো। নইলে একজোড়া শের আমাদের কানের কাছে এমনি আলাপ করা সত্ত্বেও আমরা এমন বিরক্ত হবো কেন।

একপাল পাখি প্রভাতের আগমনী গেয়ে গেল। নিস্তরঙ্গ ত্রিকুট নিমেষের মধ্যে আবার যেন ঘুমিয়ে পড়ল।

প্রভাতী আলো হাতছানি দিয়ে ডাকে আমাদের। বাইরে আসতেই দেখি স্থমুখে দাঁড়িয়ে বীর হনুমান—যেন আমাদেরই আগমন প্রতীক্ষা করে আছেন অধীর আগ্রহে। আমি বলি, 'স্থপ্রভাত।' সঙ্গীটি তো ভক্তিগদগদ।

পবনপুত্রের পেছু পেছু দশ-বিশ পা এগুতেই দেখি স্থমুখে ঝরনা। দু হাত ভরে জল খাই। হাত মুখ ধুয়ে রাত্রির ক্লান্তি কমাতে চাই।

এবারকার মতো জীবনটা বাঁচলো ভেবে সবে মাত্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি, হনুমান ঘোর কলরব তুললেন মাথার উপরে। ওঁর অকারণ লম্ফঝম্পে রীতিমত ঘাবড়ে যাই। ভালো করে কিছু বুঝবার আগেই আমাদের স্থমুখের সঙ্কীর্ণ চড়াইয়ের পথটি রোধ করে দাঁড়াল এসে বিরাটকায় বন্য অজগর। মৃত্যু পরোয়ানা ওর ঐ মস্ত হাঁ-এর মধ্যেকার সরু লকলকে জিভের ডগায়। লেজের ঝাপটে ওর ঐ কুৎসিৎ মাথাটাকে আমাদের মাথার উপর উঁচিয়ে সে যে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় আমাদের উপর। সাঁওতাল লক্ষ্য

করলে ওর হাতের বর্শা। ধনুকে বাণ যোজনা করলুম আমি চোখের পলকে। ব্যর্থ হলো সঙ্গীর বর্শা, আমার শর সন্ধান। দ্বিগুণতর গতিবেগ নিয়ে তেড়ে এলো যমদূত। পাথরের পর পাথর টপকে আসছে সর্পরাজ। আমাকেও টপকে যেয়ে সাঁওতাল ওর আক্রমণ রুখতে চায় টাঙ্গি হাতে। পলকপাতে বুঝি সাক্ষাৎ মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হবে আমাদের শেষ বোঝাপড়া।

মাথার উপর থেকে মস্ত বড় একটা পাথর গড়িয়ে দিয়ে সর্পরাজকে সংযত করলেন বীর হনুমান। আর নিমেষের মধ্যে লাফিয়ে নিচে নেমে ওর লম্বা লেজে দিলেন এক মারাত্মক টান।

ক্রুদ্ধ অজগর তার ফোঁসফোঁসানির শব্দে কাঁপিয়ে তুলল গোটা বনটা। দৈত্য দেহটিকে মোচড় দিয়ে ঘোরাতে ওকে বেগ পেতে হলো বেশ। বিদ্যুৎগতি হনুমান ততক্ষণে দিব্যি চড়ে বসেছেন মাথার উপরকার একটা সূঁচালো শিলায়। ফণায় কালকূট ঢেলে প্রতিহিংসাপরায়ণ নাগরাজ মুহূর্ত মধ্যে আবার আক্রমণ করলে বীর হনুমানকে। নিচের পথ বেয়ে হনুমান এবার নেমে পড়লেন বদ্ধ অপ্রশস্ত এক গভীর গহ্বরে। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে ভীম ভয়ঙ্কর সরীসৃপ এবার ধরা দিলে ফাঁদে। এক লম্ফে পাতাল পুরীর গহ্বর ছেড়ে বেরিয়ে এসে উপর থেকে পাথর ছুঁড়তে শুরু করলেন হনুমান। সর্পরাজ তার বুদ্ধিদোষ বন্দী হয়েছে পাথরের বন্দীশালায়।

আমরাও ততক্ষণে এসে হাজির হয়েছি আমাদের জীবনদাতার পাশে। লম্বা ন্যাড়া ডাল দিয়ে খুঁচিয়ে আমরা পিঞ্জরাবদ্ধ যমদূতকে ক্ষিপ্ত করে তুলি। খাড়াই বেয়ে বাইরে আসবার চেষ্টা করলেই আমরা ওকে খুঁচিয়ে আবার যথাস্থানে ফিরে যেতে বাধ্য করি। নাগরাজ রাগে আর হতাশায় চেঁচিয়ে বুক ফাটায় আর পাথরের গায়ে ছোঁ মেরে নিজের মুখ দিয়েই রক্ত ঝরায়। নিস্ফল চেষ্টায় ওর রাগ বাড়তে থাকে। নিজের দেহটাকে কামড় দিয়ে টুকরো

টুকরো করে ফেলতে চায়। তারপর দংশনে ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে ছটফট করতে থাকে মৃত্যু যন্ত্রণায়। হনুমান এদিকে পাথর গড়িয়ে চলেছেন। পাথরের কঠিন কবরের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল সে অল্পক্ষণেই।

আনন্দের আতিশয্যে সাঁওতালকে জড়িয়ে ধরি। কপালে দুহাত ছুঁইয়ে প্রণাম করি। কি জানি কাকে। হনুমান তখন উতরাই পথে উঁকি দিয়ে দেখছেন বার বার আর ঘন ঘন মাথা চুলকে কি যেন এক ফন্দী আঁটছেন মনে মনে। দৌড়ে যেয়ে দেখি গুহার গর্ভে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমুচ্ছে তখন জাঁদরেল গোছের শের —একটি নয়, এক জোড়া।

চোখ জুড়ানো চেহারা। এত কাছাকাছি এমনি নিশ্চিন্ত দাঁড়িয়ে আর কখনও এই রাজকীয় রূপের ঘুমন্ত সৌন্দর্য এমনি দুচোখ ভরে দেখতে পাব কিনা কি জানি। কিন্তু দুদণ্ড দাঁড়িয়ে দেখবো যে তারই বা উপায় কই। সাঁওতাল বন্ধুটি আমাকে টেনে নিয়ে চলে অন্য পথে। কিন্তু পথ কই সুমুখে। শিলাগুলো এমনি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে ওদের উপর দিয়ে নামবার চেষ্টা করার চাইতে চিত্রগুপ্তের অফিসে যেয়ে হাজির হাওয়াটাও বোধ করি অনেক সহজ। অতএব অগতির গতি শ্রীহনুমানকে স্মরণ করি দুজনেই। আর তাঁকেই অনুসরণ করে গোলক ধাঁধার এক পথ বেয়ে আমরা হাজির হলুম এক পাষাণ দুর্গে। নিরাপদ আস্তানা পেয়ে বিশ্রাম করতে বসি এবার।

গাছের তলে আপেলের মত চেহারার ক'টি পাকা ফল। কুড়িয়ে নিয়ে কামড় বসাতে যাচ্ছিলুম তারই একটাতে। হনুমান খ্যাক্ খ্যাক্ করে খিঁচিয়ে ওঠেন তক্ষুণি। সাঁওতাল বলে 'বিষফল বাবু। হনুমান খেতে মানা করছেন তোমাকে।' ফলগুলো ফেলে দিলুম মাটিতে ; হনুমান অমনি তার মুখে দিব্যি শান্ত শিষ্ট ভাবটি ফুটিয়ে তুললেন তক্ষুণি। হাত পা ছেড়ে এবার গড়িয়ে নিই একটু

শিলা-শয্যায়। নিচ্ছিলুমও তাই। হঠাৎ শুনি মিষ্টি সুরের কাঁপন লেগেছে গাছের পাতায়। কে যেন ডাক দিয়েছে দূরের কাউকে। কান পেতে শুনি প্রতিধ্বনি কি বলে। কে ডাকছে কাকে। আমার পাথরখানির উপরেই আছাড় খেয়ে পড়লো যেন সেই আর্ত কণ্ঠের ডাক। আবার—আবার। ধড়মড়িয়ে উঠি। কে ডাকে আমাকে! হ্যাঁ, ঐ তো প্রতিধ্বনি শতকণ্ঠে ডাকছে আমাকে। আমাকেই ডাকছে। প্রতিধ্বনি চেঁচিয়ে মরে—'কোথায় তুমি কোথায়!' এত্তেলা পাঠাই আমি—'এই যে হেথায়।'

উতরাই পথে কিছুটা এগিয়ে আসতেই দেখি, বন্দুক ঘাড়ে সেই নেপালী দারোয়ান। কিন্তু তার পিছনে তন্বী তনুখানিকে যিনি হিঁচড়ে টেনে টেনে চড়াই ভাঙছেন সপ্তরথীর জয়দ্রথের ভূমিকা কেন চাপাবো তাঁর ঘাড়ে। মুখোমুখি দাঁড়াতেই মেয়েটি ফিক করে হাসে। লজ্জানম্র মুখখানিকে আড়াল করতে চায়। তবুও আমি দেখতে পাই লাল ওষ্ঠের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে তার নীরব হাসি। লালরাঙানো গণ্ড বেয়ে দু চোখের জলও —মেঘ ও রোদের কি অভাবিত খেলা। বেচারা বিশু আজও সঙ্গে এসেছে। তবে ঘাড়ের বোঝা হাতে নেমেছে—একটিমাত্র টিফিন ক্যারিয়ার এসেছে শুধু আমারই জন্যে।

মানুষ বোধ হয় তার দেহটার মালিক মাত্র, মনটার নয়। পরশু রাতে যে মেয়েটিকে মন প্রথম দর্শনেই নাকচ করেছিল আজ তাকে আবার মেনে নিলে কেন পরমাত্মীয় বলে। আত্মরক্ষার অতবড় তাগিদেও কাল আমি ওদের বন্দুক নিতে রাজী হইনি। আজ সেই বন্দুকটিকেই আমি চেয়ে বসলুম। পাহাড়ের গুহায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে বনের রাজা বাঘ। মেয়েটি ভয় পায়, দ্বিধা করে, এড়াতে পারেনা তবু। আমার প্রথম প্রার্থনাকে নাকচ করবার সাহস হারিয়েছে সে। তাই হাতে তুলে দেয় অনেক অনিচ্ছায়।

সাঁওতাল বলে, 'জোড়ার দুটোকেই কিন্তু মারতে হবে বাবু।'

মেয়েটি খপ করে আমার হাত চেপে ধরে, 'কথখনো না। সংসার গড়তে জানোনা। ভাঙতেই শিখেছো বুঝি।' ওর চোখের কোণে ধমকানি।

হাসি পেল। হাতের বন্দুক হাতেই ধরা রয়েছে তখনও। নিচের পাহাড় থেকে তীরের মত ছুটে এলো আবার কার এত্তেলা। সাঁওতাল চঞ্চল হয়ে ওঠে, 'আমার বউ—আমার বউ আমাকে ডাকছে বাবু। ওরা জোড়া বেঁধে ঘুমুচ্ছে। ওদেরকে খুঁচিয়ে লাভ নেই। চল বাবু, পা চালিয়ে চল নিচে।'

মেয়েটি মুচকি হাসে শুধু।

বারো

'রাম নেই, তা রামায়ণ! পশুরাজের প্রসঙ্গ ছাড়াই পশুপর্ব।'—কথার সঙ্গে কফির পেয়ালাগুলো যেন কক্ষচ্যুত উল্কার মত ছিটকে পড়লো মার্বেল পাথরের মেঝেতে—এমনি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল শিখা। দপ করে জ্বলে উঠতে পারে বলেই তো সে শিখা।

তবে এই উত্তেজনার সঙ্গত কারণ আছে বৈকি। পশুরাজের প্রসঙ্গ দূরে থাক, নামটুকু পর্যন্ত বলিনি কোথাও। অথচ অরণ্য-ভারত তো পশুরাজের প্রসাদ বঞ্চিত নয়। গুজরাটের গির জঙ্গলে পশুরাজের দর্শনলাভ তো একেবারে দুষ্কর নয়। বিশেষ করে আমি যে সেই ভাগ্যে ভাগ্যবান।

শিখাকে বোঝাতে পারিনা—সে শুধু চোখের দেখা মাত্র। পরিচয় তো সে নয়। সে তো এমন নিবিড় করে পাওয়া নয়। বাঘকে পেয়েছি বড় কাছাকাছি। দেখেছি তার আহার-বিহার আর শিকার; দেখেছি তার চুপিসাড়ে চলা, চুরি বিদ্যের যত কলা। শুনেছি ওর যুদ্ধনাদ, বাঘিনীর সাথে নিভৃত আলাপ। দেখেছি
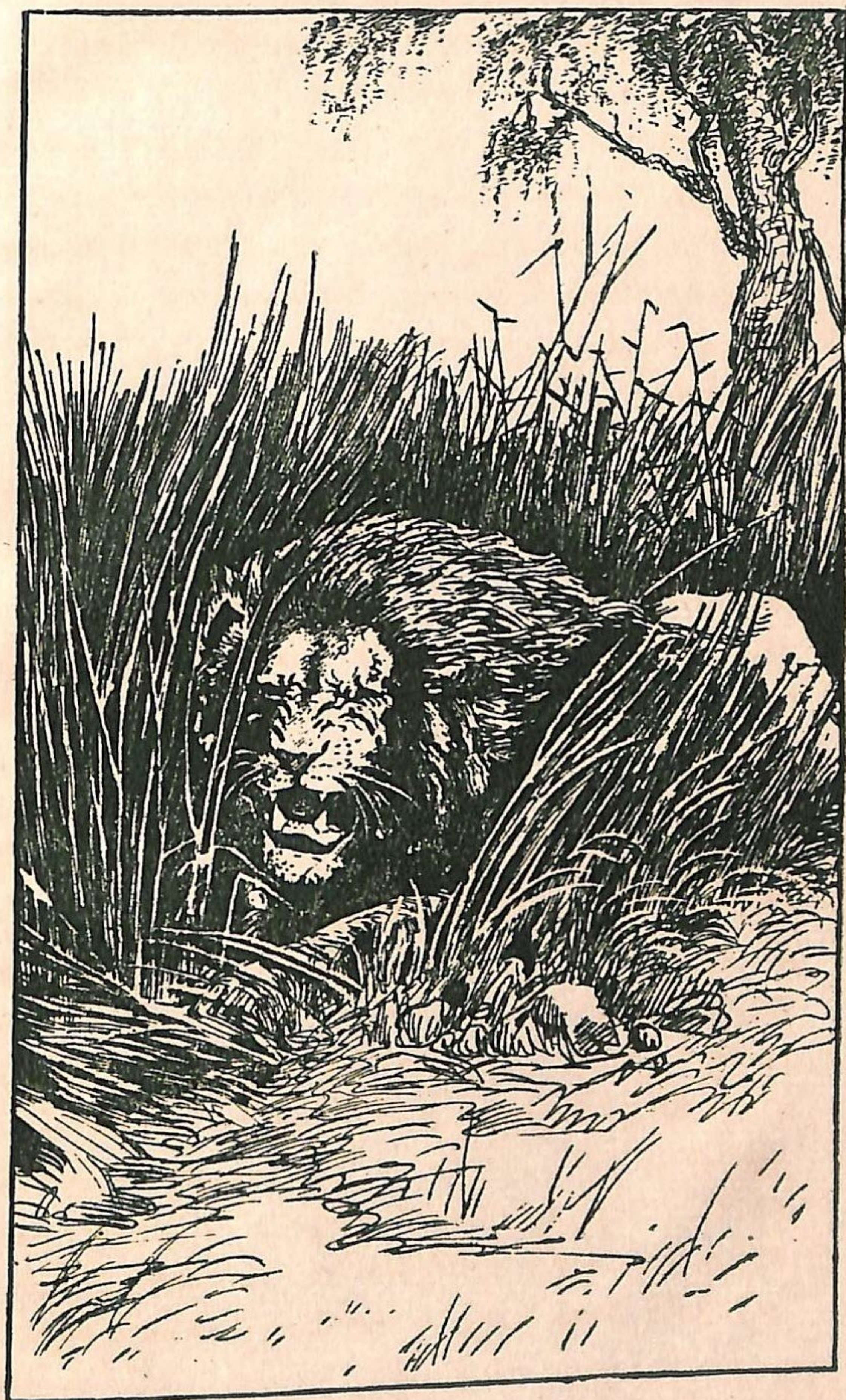
ওকে শক্তির চরমে, পৌরুষদীপ্ত সংগ্রামে—অরণ্যরাজ্যের যোগ্যতম প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে, মহাশত্রু মানুষের সাথে।

কেশরীর রূপ আছে—সে রূপ ভয়ঙ্কর আবার সুন্দরও। রাজ-জনোচিত ভঙ্গী আছে তার চলনে, মাধূর্য আছে জীবন যাপনে, ঔদার্য আছে হিংস্রতায় আর প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। তাই সে পশুরাজ।

হয়তো সবই সত্যি। তবু অরণ্য ভারতের নায়ক তো সিংহ নয়, সে বরং শার্দূল। সুন্দরবনের স্যাঁতসেঁতে মাটি থেকে হিমালয়ের পাষাণপুরী পর্যন্ত তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত। গোটা ভারতজোড়া এক অখণ্ড সাম্রাজ্যের সে একচ্ছত্র সম্রাট। সুন্দরবনের শূকর বা অজগর, আসামের হাতি-গণ্ডার বা হিমালয়ের ভল্লুক কেউ তো নেই সেই সিংহাসনের দাবিদার।

'গণ্ডার লেপার্ড আর ঐ হিমালয়ের ঋক্ষরাজবংশকে বাদ দিয়ে কি মহাভারতের বনপর্ব সম্পূর্ণ হতে পারে?'—ফোঁস করে উঠলে শিখা।

'না—তা পারেনা সত্যি। তাই তো 'অরণ্য ভারত' শেষ করিনি আমি—শুরু করেছি মাত্র। দরদী পাঠকদের তাগিদে 'অরণ্য-ভারত' এক দিন সম্পূর্ণ হবে—আজ না হোক কাল।'

কিন্তু সেকথা এখন থাক। পশুরাজের প্রসঙ্গ তুলে শিখা আমাকে দরকারী ক'টি কথা মনে করিয়ে দিলে।

গত মহাযুদ্ধের সেই ডামাডোলের এক দিনে বোম্বাই শহরের এক পার্শী পরিবার থেকে হঠাৎ তাগিদ এলো এক সন্ধ্যায়। গৃহকর্ত্রী টেলিফোনে নিমন্ত্রণ জানালেন আমাকে কোন এক হোটেলের সান্ধ্য-ভোজে। জরুরী তাগিদ। রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে না রাখতেই আবার বেজে ওঠে কিড়িং কিড়িং। সান্ধ্য-ভোজের জন্যে নির্দ্দিষ্ট সেই হোটেল থেকেই তাগিদ দিচ্ছে মিস হরওয়েল। 'সময় হয়ে গেল যে। যে মিলিটারী মার্কিন অফিসারটির সাথে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে এত আয়োজন তিনি যে আগেভাগেই হাজির। আফ্রিকার অরণ্যে কমসে কম ডজন দেড়েক সিংহ শিকার

করেছেন তিনি। চাই কি, ওঁরই সঙ্গে গুজরাট আর কাথিয়াবাড়ের জঙ্গলেও বেড়িয়ে আসবে বলে ব্যবস্থা করেছি আমি'—লোভ দেখায় মিস হরওয়েল।

সেদিনের সেই সান্ধ্য আসরে শুনেছিলুম অরণ্য আফ্রিকার জীবন প্রবাহের কথা। মুহূর্তের জন্তেও বুঝি অনুভব করেছিলুম তার নাড়ীর স্পন্দন। একটানা গল্প বলার পর সন্ধ্যা যখন গড়িয়ে চলেছে রাতদুপুরে তখন তিনি হঠাৎ থেমে বললেন, 'এবার তোমার পালা। অরণ্য ভারতের পরিচয় দেবার দায় তোমার।'

বাঘের কথাটাই বড় করে বলেছিলুম সেদিন অরণ্য আফ্রিকার পশুরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে। রাজায় রাজায় তুলনা। আকারে-প্রকারে, সংগ্রামে-শিকারে মিল কিছুটা থাকবারই কথা। অমিলটুকু তাই অনুধাবনের যোগ্য বিশেষভাবে।

আফ্রিকার সিংহের তুলনায় অরণ্য ভারতের বাঘ আকারে বড়, দৈর্ঘ্যে দীর্ঘ, প্রস্থে বিশাল আর ওজনেও ভারী।

বাঘ শক্তিতেও বড়। এমন অনেক গল্প শুনেছি যে 'বোমাস' বা 'জারিবাস' অর্থাৎ এক বুক উঁচু বেড়া লাফিয়ে সিংহ নাকি হানা দেয় গবাদি পশুর খোঁয়াড়ে আর একটি ষাঁড়কে মুখে নিয়ে দিব্যি আবার বেরিয়ে আসে বেড়া টপকে। এ হেন গল্প নিতান্তই গালগল্প। সুন্দরবনের আবাদী অঞ্চলেও বাঘের সম্পর্কে হামেশাই শুনতে পাওয়া যায় এমনি গল্প। সেও আষাঢ়ে গল্প বৈকি।

বাঘকে দেখেছি, যৌবনমত্ত দুরন্ত শক্তিধর। তবু প্রমাণ মাপের মানুষকে মুখে তুলে নিয়ে যেতে হিমসিম খাচ্ছে সে। বড়জোর বিশ পঁচিশ পা। তারপর সে শিকারকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলে মাটির উপর দিয়ে। গোরু মহিষ তো দূরের কথা, একটা চিতল বা বারশিঙাকেও সে মাটিতে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলে। শিকারকে পাশ পাশে টেনে নিয়ে চলাটাই তার অভ্যাস। ভারী ওজনের শিকারকে কিন্তু পাশাপাশি টেনে নিয়ে যেতে অসুবিধা হয়ে থাকে

বলেই সে তাকে পেছনে টেনে নিয়ে চলে। যাঁরা অরণ্য আফ্রিকা আর মহাভারতের খবর রাখেন তাঁরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে সিংহের তুলনায় বাঘ বেশি শক্তিধর। বাঘের পক্ষে যা সম্ভব নয়, সিংহ তা পারবে কেমন করে ?

মার্কিণ ভদ্রলোকটিও বললেন, বেড়া টপকে সিংহের ষাঁড় মুখে নিয়ে যাওয়ার গল্পগুলো কল্পনা প্রসূত মাত্র, নিতান্তই আজগুবি। তবে এই গল্পগুলোর সত্যাসত্য যাচাই করতে গিয়ে সরজমিনে তদন্ত করেছি কয়েকবার সুন্দরবনের আবাদী অঞ্চলে। রাতের ঘটনা রাতের শেষে তদন্ত করলেই প্রমাণ মেলে হাতেনাতে। আসলে যা ঘটে সেটি একেবারেই আলাদা রকমের।

মাঝরাত্রিতে খোঁয়াড়ের আনাচে কানাচে এসে বাঘ চাপা গলায় গর্জন করে—'আ-আ-হুম-ম্-ম্'। ভয় দেখায় অবলা জানোয়ারকে। খোঁয়াড়ের গোরু মোষ তখন হুটোপুটি শুরু করে দেয় প্রাণ ভয়ে, ছুটে পালাতে চায় বেড়া ভেঙে। বেড়াও ভাঙে। শিকারও ধরা পড়ে। এই সব ক্ষেত্রে একটি মাত্র শিকার ধরে নিয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়াটাই বাঘের লক্ষ্য। শিকারকে সে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেছে তার প্রমাণ তো থাকেই। আরও দেখা যায় যে খোঁয়াড়ের মধ্যে বাঘের পায়ের ছাপ নেই একটিও। অথচ খোঁয়াড়ের বাইরে পায়ের ছাপের চিহ্ন দেখে তার যাতায়াত আর চলাফেরার হদিস করা মোটেও কঠিন কাজ নয়।

'সিংহও একটি মাত্র শিকার ধরে'—খুব জোর দিয়েই কথাটা বললেন মার্কিণ ভদ্রলোকটি। তা বলে এই ব্যাপারে কিন্তু বাঘ আর সিংহের স্বভাবে মিল নেই মোটেও। একেবারে একটি মাত্র শিকার, একটি হত্যা—সেটি সিংহের স্বভাব। বাঘের হত্যা প্রায়ই নির্বিচার রকমের। গোরুর পালে হানা দিয়ে কিংবা হরিণের পালে ঢুকে পড়ে সে একসঙ্গে চারপাঁচটিকেও হত্যা করেছে, অথচ টেনে নিয়ে গেছে মোটে একটিকে—এমন নজীরও চোখে দেখেছি।

একবার এক শূকরী মা আর তার গোটা তিনেক শিশু সন্তানকে হত্যা করেছিল এক বাঘ। সম্ভবতঃ কাউকেই সে নিয়ে যায়নি সেবার। জাতশত্রু শূকরের কথাটা না হয় বাতিল করা যায়। বাগে পেলে শত্রুর শেষ রেখোনা—হয়তো বাঘের শাস্ত্রেও লেখা আছে ঐ নীতিবাক্যটি। কিন্তু একই সঙ্গে এতগুলি গোহত্যা!

কথা ওঠে, বনের মধ্যে জন্তু জানোয়ারের শব বা অর্ধভুক্ত দেহ থেকে কেমন করে চেনা যাবে তার হত্যাকারীকে। চিনবার উপায় আছে বৈকি।

বাঘ শিকারের ঘাড় ভাঙে। আহারের বেলায় কিন্তু শিকারের পেছনের অংশটুকুতেই সে প্রথম আহার সারে—এইটেই এক মজা। প্যান্থার আবার শিকারের কাঁধ, বুক বা পিঠের যে কোন অংশ থেকেই তার প্রথম আহার শুরু করে। অবিশ্যি খুব বড় জাতের প্যান্থারের স্বভাবটা এ বিষয়ে বাঘের মতই অনেকটা। বাঘের শিকার ধরবার কৌশল সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। বলডুইন সাহেব তাঁর 'লার্জ এণ্ড স্মল গেমস অফ বেঙ্গল' বা বাঙলা দেশের বড় এবং ছোট বন্য শিকার নামক গ্রন্থে বলেছেন যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঘাড় মটকে শিকারকে বধ করে বাঘ। স্টার্নডেল সাহেব আবার তাঁর 'ম্যামালিয়া অফ ইণ্ডিয়া'তে বা ভারতের স্তন্যপায়ী জীব সম্পর্কিত বইয়ে বলেছেন যে বাঘের কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা—এইটেই তার কৌশল।

মোষ আর বাঘের লড়াইয়ে বাঘকে থাবা মারতে দেখেছি মোষের মাথায়। কিন্তু তাতে মোষকে বিশেষ কাবু মনে হয়নি। কেননা শেষ পর্যন্ত মোষ পালিয়ে গেল। গোরুর পালেও আমি বাঘকে হানা দিতে দেখেছি বার কয়েক। ষাঁড় আর মোষের সাথেও লড়াই করতে দেখেছি বাঘিনী আর তার বাচ্চাকে। কালী কপালীর সাথেও হাতাহাতি লড়াই করতে দেখেছি বাঘ আর বাঘিনীকে। বাঘের হাতে আহত এমন কয়েকটি মানুষকেও

সত্য সত্য পরীক্ষা করবার সুযোগ পেয়েছি গোসাবা বা হ্যামিলটন সাহেবের আবাদে কিংবা কদমতলী ফরেষ্ট অফিসের এলাকায়। সব দেখে শুনে এই কথাটাই আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে যে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থাটাই হচ্ছে বাঘের শিকার পদ্ধতির মোদ্দা কথা।

হরিণের পিঠের উপর লাফিয়ে উঠেছে বাঘ। বোঝার ভারে হরিণ যদি মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে তাহলে কণ্ঠের কাছাকাছি কোথাও দুপাশ থেকে নখ ফুটিয়ে কণ্ঠনলী ছিঁড়ে ফেলবে সে। কিন্তু যদি তার বোঝাটাকে পিঠে নিয়েই শিকার ছুটতে থাকে তাহলে বাঘ থাবা বসাবে শিকারের ঘাড়ে অথবা মাথায়। থাবার আঘাতে সে শিকারকে পঙ্গু করে দিতে চায়। ষাঁড় বা মোষের সাথে লড়ায়ে ধরাশায়ী শিকারের পেছনের পা দুটির হাঁটুর জোড় প্রায়ই ভাঙা দেখা যায়। শূকরের সাথে সংগ্রামে বাঘ শূকরের পিঠের উপর লাফিয়ে উঠতে চেষ্টা করেনা। বিদ্যুৎগতি চলনের মাঝখানে বাঘ চায় শূকরের ঘাড়ের উপর কামড় বসাতে। কিন্তু প্রায়ই সে সুবিধে হয়না বলেই সুযোগ মত সে শূকরের পেছনের পা দুটিকে ভেঙে দিয়ে তাকে কাবু করতে চেষ্টা করে।

মানুষের সাথে মুখোমুখি লড়াইয়ে পিছনের দুপায়ে ভর দিয়ে বাঘ থাবা বসায় মানুষের কাঁধে। কিন্তু মানুষের গলাটাকে কামড়ে ধরে তাকে হত্যা করাটাই বাঘের স্বভাব। কালী কপালী আর ময়নার বেলাতে বাঘের এই কৌশল সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি। বাঘের থাবায় প্রচণ্ড শক্তি আছে বটে। কিন্তু দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার ফলে ওর থাবার আঘাতে জোর থাকেনা তেমন। কালী তাই প্রায়ই আমাকে হুঁসিয়ার করে দিত—'বাঘের প্রথম ধাক্কায় চিৎপাত হয়ে পড়বেই পড়বে। কিন্তু হুঁসিয়ার, মাথাটাকে সাবধান রেখো। যতক্ষণ না মাটিতে তোমাকে পেড়ে ফেলতে পারে ততক্ষণ ওর থাবাকে ভয় নেই। তাই ওর পেটের তলে শুয়ে থাকাটাই সব চাইতে নিরাপদ। একটা হাত ওর মুখের মধ্যে

ঢুকিয়ে দিয়ে আর একটা হাতে গলা জড়িয়ে থেকো।'

কালীকেও আমি দু-তিনবার ঠিক এই কৌশলে বাঘকে কাবু করতেও দেখেছি। কিন্তু আমি যে এই কৌশলটাকে প্রয়োগ করে দেখতে পারিনি তার জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ।

সিংহ আর বাঘের হত্যা পদ্ধতিতে তফাৎ নেই বিশেষ। তবে সিংহ অনেক সময় দল বেঁধে শিকার করে, বাঘের বেলায় এমনটি চোখে পড়েনা কিন্তু। দল বেঁধে শিকার করা দূরে থাক একই দলে ওদের একজোড়ার বেশি দেখা যায়না প্রায়ই।

ইংরেজীতে শিকারের ভাষায় যাকে বলে 'কীল' অর্থাৎ অর্ধভুক্ত এবং সঞ্চিত আহারের কাছে আসবার সময় সিংহের সাবধানতার কথা নিয়ে কটি গল্প বললেন ঐ মার্কিণ শিকারী। সিংহ সে বেলায় খুব হুঁসিয়ার বটে। তবু বাঘের তুলনায় সে অনেকখানি বোকা বৈকি। সন্দেহের কারণ থাকা সত্বেও ক্ষিধের জ্বালায় সিংহ শেষ পর্যন্ত তার সঞ্চিত আহারের কাছে আসে। বাঘ কিন্তু আসেনা। একবার আহার শুরু করলে সিংহ সহজে নড়তে চায়না। বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ পেলে বাঘ কিন্তু গা ঢাকা দেবে তক্ষুণি।

সিংহ তার পরিবারবর্গ নিয়ে বাস করে শুনলুম। বাঘের সঙ্গে তার স্ত্রী পুত্রকে অমি দেখিনি কিন্তু কোথাও। আবাদী অঞ্চলের লোকের ধারণা বাঘ তার পুত্রসন্তানগুলিকে হত্যা করে বলেই প্রসবের আগে বাঘিনী বন ছেড়ে আসে। হয়তো কথাটা সত্যি।

চেহারা-ছবিতে বাঘের সঙ্গে মিল নেই সিংহের। সিংহীর সাথে কিন্তু প্রচুর মিল আছে চিতার। সত্যি বলতে কি, চিন্দওয়ারার জঙ্গলে একবার একটা বড় জাতের চিতাকে আমরা সিংহী বলেই ভুল করেছিলুম প্রথমটা।

বাঘের চোখ দ্যুতিময় জ্বলন্ত, বাঘের শ্রবণশক্তিও প্রখর। কিন্তু ঘ্রাণশক্তি তেমন প্রখর নয় বলেই মনে হয়। বনের মধ্যে বনচারীদের চলাফেরার একটা পথ থাকে সাধারণভাবে কোন নালা বা খাল

বরাবর। এই রাজপথটিকে এড়িয়ে চললে বাঘের কবলে পড়বার ভয়টাও থাকে কম।

প্যান্থার গাছে চড়ে আর চিতা তো এ বিষয়ে পাকা ওস্তাদ। বাঘকে অবিশ্যি গাছে চড়তে দেখিনি। তবে সুন্দরবনের এক ভারী গাছের প্রায় দশফুট উঁচুতে বসে কোন একটি বাঘ যে তার নখরে শান দিত তার প্রমাণ পেয়েছি।

সাধ্যমত ব্যাঘ্র-চরিত্র ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছি। অনেক বলেছি বটে, তবু বাকী রয়ে গেল যে আরো অনেক। সেকালের কবিরা রাজ-মাহাত্ম্য বর্ণনা করে রাজ-অনুগ্রহ লাভ করতেন। অরণ্যরাজের প্রসাদ পাবার ভরসা নেই। পাঠক সমাজের প্রসাদ পেলেই ধন্য হবো আমি, সার্থক হবে 'অরণ্য ভারত'।

ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র অনেক কাণ্ড করে বশিষ্ঠ মুনির স্বীকৃতি পেয়ে ব্রাহ্মণ হলেন শেষ পর্যন্ত। কিন্তু অনেক মেহনত করেও ময়না শিকারীর স্বীকৃতি না পেয়ে জাতে উঠতে পারিনি আমি। বাঘের মুখোমুখি দাঁড়াবার মত বুকের পাটা থাকাটাই বড় কথা নয়, সব্যসাচীর হাত আর লক্ষ্যভেদী ক্ষিপ্রতাও শেষ কথা নয়। ময়না বলতো, শিকারীর মন নেই আমার, চোখও নেই তাই।

আমার এ লেখায় তাই শিকারীর কতটুকু আনন্দ আছে জানিনা। তবে বনের বাঘ যেন কল্পনার রাজ্য ছেড়ে বাস্তবে চিত্রিত হয়—এইটুকুই চেষ্টা করেছি আমি।

অপরিচয়ের বেড়া ভেঙে দিয়ে অনেকের কাছে সে পরিচিত হোক তার আপন মহিমময় রাজশ্রীতে। বাঘ মানুষ মারে। মানুষের তুলনায় সে শক্তিধর। মানুষ তাই বাঘকে ভয় করতেই শিখেছে। মানুষ যদি জানতো যে বাঘও তাকে ভয় করে তাহলে সে বাঘের প্রসঙ্গ নিয়ে এত মাথা ঘামাতে চাইবেনা আর। তবু বলি একদিনের এক ঘটনা—এই বইয়ের শেষ ক'টি কথা আমার।

আবাদী অঞ্চলের শরৎকালে দিন দুপুরেও ভেড়ীর পথ বড়

ভয়াবহ। ভেড়ীর পাশে ঘন কেওড়ার জঙ্গলে বা পাকা ধানের ক্ষেতে আস্তানা গাড়ে এসে বাঘিনী। এমনি একদিনের এক কাঠফাটা রোদ্দুরের মধ্যে ভেড়ীর পথে কাছারীতে আসছি আমি। সঙ্গে ছিল শুধু কাছারির লাঠিয়াল দীনু। হঠাৎ একটা ক্রুদ্ধ গোংরানি শুনে হকচকিয়ে গেলুম একেবারে। ভেড়ীর নিচেই কেওড়ার জঙ্গলে এক বাঘিনী। হাতে ছিল একগাছা মোটা বেতের লাঠি। নিরুপায় হয়ে বাতাসে সেটিকে আস্ফালন করতেই শব্দ হল—'সাঁই-সাঁই'। ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে দীনু হুঙ্কার ছাড়ে, 'তবে রে শালী!' দীনুর পাঁচ-হাতি লাঠি তখন দুরন্তবেগে পাক খাচ্ছে—'শন্-শন্-শন্'। দীনুর পাঁয়তারা দেখে বাঘিনীও ঘাবড়ে গেল রীতিমত। লম্ফঝম্ফ দিয়ে দীনু এগিয়ে আসতেই বাঘিনীও ঝাঁপ দিলে নদীতে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই নদী পেরিয়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেল ওপারের গভীর অরণ্যে।